রহস্যময়ী
নারী
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

রহস্যময়ী নারী-৮৩

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর আশাকে সরিয়ে দিতে পারল না, বরং ওকে অভয় দিয়ে বললো—আশা, ভয় পেও না, এ নারী রহস্যময়ী। বড় অদ্ভুত, বড় বিস্ময়কর এ নারী! জানি না কোথায় এর জন্ম—কে এর বাবা-মা—তবে ও মানুষ, এটা সত্য।

আশা ফিরে তাকালো দরজার দিকে, ততক্ষণে নারীমূর্তি সরে গিয়েছে গুহামুখ থেকে।

আশা এতক্ষণে যেন কিছুটা সাহস পেল, বললো ঠিক ভূত-প্রেতের মত।

হাঁ, কতকটা তাই।

এ পর্বতের শৃঙ্গদেশে ও এলো কি করে?

আমিও তাই ভাবছি, কারণ ওকে আমরা প্রথম দেখেছিলাম পর্বতের পাদমূলে নির্জন এক গুহার মধ্যে।

তোমরা মানে—তোমার সঙ্গে কেউ ছিল নাকি?

হাঁ, আমার হিন্দল ঘাটির প্রধান সহকারী হায়দার আলী ছিল আমার সঙ্গে।

কোথায় সে?

তাকে বিদায় দিয়েই আমি তোমার উদ্ধার আশায় পর্বত বেয়ে উপরে উঠছিলাম কিন্তু পর্বতের শৃঙ্গদেশে উঠার পূর্বেই গড়িয়ে পড়ি..........

বলো কি বনহুর, তুমি পর্বত থেকে গড়িয়ে পড়েছিলে?

হাঁ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

কি ঘটেছিল?

আমি পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠছিলাম, প্রায় অর্দ্ধেকটা পথ উঠে এসেছি, ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি ছোট পাথরখণ্ড সা করে চলে গেল আমার কানের পাশ কেটে। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেমন পিছু হটেছি অমনি গড়িয়ে পড়লাম, কয়েক মিনিট পর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

সর্বনাশ, তারপর?

তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম অন্ধকার এক গুহায় বন্দী অবস্থায় রয়েছি..........বনহুর তারপরের ঘটনাগুলো বলে গেল আশার কাছে।

আশা সব শুনে অবাক হলো। তবে সব চাইতে বেশি অবাক হলো রহস্যময়ী নারী সম্বন্ধে—কে এই উলঙ্গ নারী কে জানে!

বনহুর বললো—আশা, তুমি বিশ্বাস করছো না, আমি নিজ চোখে দেখেছি ঐ নারীটি আমাদের মৃত অশ্বটির মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

হাঁ, বিশ্বাস করছি! কারণ ঐ নারীটির যে মূর্তি আমি স্বচক্ষে দেখলাম তা সত্যি ভয়ঙ্কর। না জানি কে ও।

আশা, আমি চাই ঐ নারীটাকে আটক করতে এবং তার জীবন রহস্য উদঘাটন করতে। আশা, এ ব্যাপারে তোমার সহায়তা পেলে উপকৃত হব।

আশা বললো—তুমি যা বলবে আমি তাই করব বনহুর। আমাকে চীনা দস্যু নাংচুর কবল থেকে রক্ষা করেছ, আমি কোনদিন তোমার এ উপকারের কথা ভুলবো না। শুধু নাংচুর কবল থেকেই নয়, তুমি আমাকে সাগরের বুক থেকে রক্ষা করেছ, সেদিনের কথা আজও মনে হলে আমি শিউরে উঠি।

আর তুমি! কতবার যে আমাকে সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছ, তার জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আশা।

বনহুরের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আশার মনে এক অনাবিল মধুর আনন্দ দোলা দিল।

আশা অন্ধকারে ভাল করে একবার দেখতে চাইলো বনহুরের মুখখানাকে। ও মুখখানাই যে তার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা। এত কাছে আছে ও তবু যেন কত দূরে— ঐ তো ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওর দেহের উষ্ণ তাপ লাগছে তার দেহে, তবু কেন ওকে এত দূরে মনে হয় ভেবে পায় না আশা।

রাত বেশি ছিল না, কিছুক্ষণ পর পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসে। আকাশে তারার প্রদীপগুলো মুছে যায় নীলাভ রঙের মাঝে।

নাম না জানা দু'চারটে পাখি উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে।

সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে পর্বতের গায়ে গায়ে—বরফের রূপালি স্তরে ঝলমল করে উঠে।

বনহুর তাকায় আশার মুখের দিকে।

রাতের অন্ধকারে উভয়ে উভয়কে তেমন করে দেখতে পায়নি। কতদিন পর বনহুর দেখলো আশাকে। বন্দিনী অবস্থায় আশার দেহ কিছুটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো, বসন ছিন্নভিন্ন—দেহের কিছু কিছু অংশ নজরে পড়ছিল।

লজ্জায় কুঁকড়ে যায় আশা।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, বলে—চলো এবার এগুনো যাক।

আশা বিনাবাক্যে পা বাড়ায়।

বনহুর বললো—খুব সাবধানে পা ফেলবে, একটু অন্যমনস্ক হলে মৃত্যু অনিবার্য।

আশা তাকিয়ে দেখলো নিচে গভীর খাদ। বেশি ভয় না পেলেও মনে মনে একটু শিউরে উঠলো! যত দুঃসাহসীই হোক না কেন, সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে নিচের দিকে চাইলে হৃদকম্প হবার কথাই বটে।

আশার মনোভাব তার মুখে কিছুটা পরিলক্ষিত হলো।

বনহুর হাত বাড়ালো—এসো, আমার হাত ধরে চলো।

আশা বনহুরের হাতে হাত রাখলো।

দিনের আলোতে বনহুর দেখলো আশার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। সে যে তাকে ভালবাসে জানতো বনহুর। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

রাতের অন্ধকারে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি আশা, এবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বনহুরের কপালে। কিছুটা রক্ত তখনও শুকিয়ে আছে কপালের একপাশে।

আশা ব্যথিত কণ্ঠে বললো—ইস্, কপালটা কতখানি কেটে গিয়েছিল তোমার!

হাঁ, তবে তেমন কিছু না।

অতখানি কেটে গেছে তবু বলছো তেমন কিছু না? এসো আগে তোমার কপালের ক্ষতটা বেঁধে দিই।

থাক, লাগবে না।

আমার জন্য তুমি কত কষ্ট করলে বনহুর!

এটা আমার কর্তব্য আশা। চলতে চলতে বললো বনহুর।

আশার হাতখানা তখনও বনহুরের হাতের মুঠোয় ছিল।

আশাকে বড় উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। আজকের দিনটা যেন তার জীবনে এক পরম শুভদিন। বললো আশা—কর্তব্যই তোমার জীবনের ব্রত জানি, কিন্তু........

বলো, থামলে কেন?

তুমি চিরদিন কর্তব্য পালনই করে যাবে?

ঐ তো বললে আমার জীবনের ব্রত কর্তব্য পালন করা।

সত্যি তুমি বড় খেয়ালী মানুষ।

একথা সবাই বলে।

বনহুর!

বলো?

আমি একটা প্রশ্ন করব যদি সঠিক জবাব দাও?

নিশ্চয়ই দেব, তবে পর্বতের শৃঙ্গদেশে দাঁড়িয়ে নয়, কারণ তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যদি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি? বলে হাসলো বনহুর।

আশা বললো—ঠিক বলেছ, যদি নিজকে সংযত রাখতে না পার।

তোমার প্রশ্ন তাহলে অত্যন্ত কঠিন হবে?

হেসে বললো আশা—যদি কঠিন মনে কর তবে কঠিন নয়-সহজ।

হঠাৎ বলে উঠে আশা—দেখ দেখ, বরফের চাপের উপর মানুষের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর তাকালো নিচে, একটা বরফের উপরে কয়েকটা দাগ, দাগগুলো মানুষের পদচিহ্ন তাতে কোন ভুল নেই।

আশা বললো—আশ্চর্য, পর্বতের এত উপরে মানুষের পায়ের দাগ এলো কি করে?

বনহুর বললো—আশ্চর্য কিছু নয় আশা, এ পদচিহ্ন সেই রহস্যময়ী নারীর।

আশা তাকালো বনহুরের দিকে, দু'চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে, বললো সে—সেই নারীটি পর্বতময় ঘুরে বেড়ায় নাকি?

হাঁ আশা, এ পদচিহ্নই শুধু নয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেশেও আমি তার হাস্যধ্বনি শুনেছি। নিশীথ রাতের অন্ধকারে সে বিচরণ করে ফেরে পর্বতের দুর্গম শিখরে। অদ্ভুত নারী!

রহস্যময়ী নারী সম্বন্ধে শুধু আশারই নয়, বনহুরের মনেও বিরাট প্রশ্ন জাগছে কিন্তু কে তার সমাধান করবে! জনমানবহীন দুর্গম পর্বতমালার পাদমূলে অদ্ভুত এ নারী—কি এর পরিচয় কেউ জানে না।

এক সময় নেমে আসে আশা আর বনহুর পর্বতমালার ঠিক মাঝামাঝি। সম্মুখে একটি বরফের চাপে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠে উভয়ে। বরফের চাপে রক্তের ছাপ লেগে আছে।

আশা নত হয়ে দেখে নিয়ে বললো—তাজা রক্ত। কিন্তু এখানে রক্ত এলো কি করে!

বনহুর নিজেও কিছুটা অবাক হয়েছে।

বললো আশা—মনে হচ্ছে এখানে কাউকে হত্যা করা হয়েছে এত রক্ত.........

বনহুর বরফের চাপটা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিল।

হঠাৎ তাদের পিছনে কেউ হেসে উঠলো খিলখিল করে।

উভয়ে চমকে ফিরে তাকালো।

সূর্যের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল সেই উলঙ্গ নারীমূর্তি কিছুটা উপরে পর্বতের একটি ধাপে দাঁড়িয়ে হাসছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো ওরা দু'জন। নারীটির ওষ্ঠদ্বয় রক্তে রাঙা হয়ে আছে। শুধু ওষ্ঠদ্বয় নয় প্রায় গোটা মুখমণ্ডলে রক্তের ছাপ লেগে আছে। হঠাৎ হাত দু'খানা তুলে ধরলো সে উপরের দিকে। বনহুর আর আশা আরও বিস্মিত হলো রহস্যময়ী নারীর দু'হাতেও রক্তের ছাপ!

বনহুর বললো—আশা, মনে হচ্ছে এই রহস্যময়ী নারী কাউকে হত্যা করে তার রক্তামাংস খেয়েছে। দাঁড়াও, আমি নিজে দেখে আসি কে কোথায় কাকে হত্যা করলো।

এই দুর্গম পর্বতমালার উপরে তুমি কোথায় যাবে বনহুর? চলো তার চেয়ে নিচে নেমে যাই।

না আশা, দেখে আসি, কারণ আমি এই রহস্যময়ী নারীর আসল পরিচয় উদঘাটন করতে চাই।

বনহুর, তোমার বাসনা বড় অদ্ভুত, কারণ ওর আসল পরিচয় সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

আমি তা জানি আশা, আর জানি বলেই চাই জানতে। এই জনহীন পর্বতমালার দুর্গম স্থানে কি করে এলো সে? আমার মনে হয়, ঐ রহস্যময়ী

নারী কোনদিন মানুষের সংস্পর্শে আসেনি। যদি সে আসতো তাহলে এমন হতো না। জানোয়ারের চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়। শুধু জানোয়ার নয়, হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠেছে সে। কাঁচা মাংস সে খায় এবং আমার মনে হচ্ছে সে জীবজন্তু পাকড়াও করে হত্যা করে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর আমি আসছি।

কিন্তু আমি এখানে একা একা......

ভয় পাবার মেয়ে তুমি নও আমি জানি আশা। তবে আমি বেশিক্ষণ দেরী করব না। চলে যায় বনহুর।

ততক্ষণে সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে।

বনহুর পর্বতের গা বেড়ে উঠে যায়, যেখানে একটু পূর্বে সেই নারী দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসছিল। কিছুদূর এগুতেই বনহুর দেখতে পেল বরফের চাপে পায়ের ছাপ পড়েছে। বেশ স্পষ্ট দাগগুলো এগিয়ে গেছে সম্মুখ দিকে। বনহুর সেই দাগ লক্ষ্য করে এগুতে লাগল।

বেশিদূর এগুতে হলো না, হঠাৎ একটা বরফের চাপের আড়ালে নজর পড়তেই দেখতে পেল বনহুর একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। তার বুকের পাশে খানিকটা ক্ষত। ক্ষত জায়গাটা লাল টক্ টক্ করছে। মৃতদেহটা পচা বা বাসি নয়, সদ্য নিহত বেশ বুঝা যাচ্ছে।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো মুহূর্তের জন্য।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, হয়তো বনহুর সেই রহস্যময়ী নারীটিকে লক্ষ্য করল। না, ওকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বা চলে গেছে অন্য কোন দিকে। বনহুর এসে দাঁড়ালো মৃতদেহটার পাশে। প্রথমে চমকে উঠেছিল বনহুর, যে লোকটার মৃতদেহ সে দেখেছিল তার দেহটা ছিল বেশ মোটাসোটা, কতকটা হায়দার আলীর মত। তাই বনহুর প্রথমে চমকে উঠেছিল কিন্তু পরক্ষণে সে বুঝতে পারল তার অনুমান সত্য নয়—নিহত ব্যক্তি হায়দার আলী নয়। লোকটা কোন জাহাজের খালাসি হবে, কারণ তার দেহে খালাসির পোশাক ছিল।

বনহুর উবু হয়ে দেখতে লাগল লোকটাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারল বনহুর, লোকটাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। গলায় স্পষ্ট আংগুলের চাপ কালো হয়ে আছে। ঠিক চিবুকের নিচেই দাঁতের আঘাতের চিহ্নিত ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। বুকের পাশেও একটি বিরাট ক্ষত, সেখানে কিছুটা মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। কি

নৃশংস হত্যাকান্ড! বনহুর লোকটাকে উল্টেপাল্টে দেখলো। বুঝতে তার বাকি রইলো না এ হতভাগ্য লোকটিকে ঐ রহস্যময়ী নারীই হত্যা করেছে।

বনহুর নিহত লোকটিকে ভালভাবে দেখলো, তারপর নেমে এলো পর্বতের মাঝামাঝি আশা যেখানে অপেক্ষা করছিল। বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বনহুর ফিরে এসেছে দেখে আশার চোখ দুটো খুশিতে ঝলমল করে উঠলো যেন, বললো আশা—ভাবছিলাম এতক্ষণ আসছো না, নতুন কোন বিপদ হানা দিল কিনা কে জানে!

আমার বিপদ এলেও তেমন কিছু ভাববার ছিল না। তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো?

না।

চলো এবার নিচে নামা যাক।

বনহুর নামতে শুরু করলো।

আশাও নেমে চললো বনহুরের পিছনে পিছনে।

বনহুর চলতে চলতে বললো—যে রক্তের ছাপ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তা কোন জীবজন্তুর নয়, মানুষের।

আশা অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—মানুষের রক্ত এত উপরে এলো কি করে!

ঐ রহস্যময়ী নারীর শিকার।

শিকার?

হ্যাঁ।

একটি জীবন্ত লোককে সে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করেছে?

শুধু হত্যাই নয়, তাজা রক্ত সে পান করেছে।

আশা বললো—সে রাক্ষসী না মানবী।

মানবীই বটে কিন্তু রাক্ষসীও বলা চলে।

বনহুর আর আশা পর্বতমালার পাদমূলে যখন নেমে এলো তখন পুনরায় রাতের আঁধার নেমে এসেছে। সুউচ্চ পর্বতের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্যের শেষ আলোকরশ্মিটুকু।

বললো বনহুর—আশা, আজকের রাতটা আবার আমাদের একই গুহায় কাটাতে হবে। জানি এতে তোমার বেশ দ্বিধা আছে তবু বাধ্য হয়েই……

বনহুর, তোমার কাছে আমার কোন দ্বিধা নেই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

সত্যি বলছ আশা?

হাঁ বনহুর।

তবে চলো, সম্মুখে আমার পরিচিত একটি গুহা আছে, ঐ গুহায় আজ আমরা রাত কাটাব।

পর্বতমালার পাদদেশ ধরে চললো ওরা দু'জন। অদূরে পড়ে আছে তাদের মৃত অশ্বটা। যদিও সেটা এখন শিয়াল-শকুনি আর বন্য জীবজন্তুর আহারের সামগ্রি হয়েছে, তবু তখন সেখানে কোন ভক্ষণকারী ছিল না।

বনহুর আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—ঐ সেই অশ্ব যে অশ্বটিকে হত্যা করেছিল পশুরাজ গন্ডারটি। জান আশা, গন্ডারটিকে পশুরাজ বললাম কেন? কারণ, এখানে এসে অবধি ঐ গন্ডারটির মত বৃহৎ জীব আমার নজরে আর পড়েনি।

আশা ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে অশ্বটিকে দেখলো, তারপর বললো—বেচারী অশ্ব!

হাঁ আশা, বেচারীই বটে, কারণ সে কি জানত আর সে ফিরে যাবে না! চলো ঐ তো সম্মুখে আমাদের সেই গুহা।

আশা নীরবে বনহুরকে অনুসরণ করলো।

এ সেই গুহা যে গুহায় সেদিন হায়দার আলী আর বনহুর রাত কাটিয়েছিল। যেখানে আগুন জ্বেলেছিল সেখানে এখনও শুকনো পাতার ভস্মগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বনহুর তার ক্ষুদ্র টর্চের আলো ফেলে লক্ষ্য করলো গুহার মধ্যে চারদিকে। একপাশে কতগুলো শুকনো পাতা জড়ো করা আছে এবং সেই পাতার কুন্ডলির মধ্যে বেশ একটা শয্যা তৈরি করা আছে। কেউ যেন এখানে রাত্রি যাপন করে বলে মনে হলো।

আশা বললো—একি, এখানে কেউ বাস করে নাকি?

হাঁ, এখানে বাস করে সেই মানবী…যাকে আমরা দেখে এলাম পর্বতের সুউচ্চ শিখরে কোন এক জায়গায়।

সর্বনাশ!

এ ছাড়া কোন উপায় নেই আশা। বস এখানে, পা দু'খানা বড় শিথিল হয়ে এসেছে, তা ছাড়া ক্ষুধা……আশা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, সামান্য কিছু পানীয় পেলেও বড় উপকার হতো!

বনহুরের কথাগুলো আশার মনে আঘাত করলো, তার নিজের চেয়ে বেশি দুঃখ, বেশি ব্যথা পেল সে বনহুরের জন্য।

পাশাপাশি দুটো পাতার বিছানা পেতে নিল ওরা। অবশ্য আশাই বিছানার মত করে বিছিয়ে নিচ্ছিলো পাতাগুলো। বনহুর বাইরে থেকে এনে দিচ্ছিলো শুকনো পাতার স্তূপ।

বড় ক্ষুধা, তবু যেন আনন্দের উৎস বয়ে চলেছে আশার মনে, জীবনে এমন দিন আর আসবে কিনা কে জানে!

বনহুর তার জীবনের কামনার জন—তাকে সে এত কাছে পেয়েছে, এ যেন তার স্বপ্ন!

আশার মুখখানা গুহার অন্ধকারে যদিও দেখা যাচ্ছিল না তবু বনহুর বেশ বুঝতে পারছিল আশার হৃদয়ে অনাবিল একটা খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে চলেছে। ক্ষুধা-পিপাসার কথা ভুলেই গেছে যেন ও।

বনহুর পাতার বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাবছে আর কতক্ষণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করা সম্ভব হবে—সামান্য কিছু খাবার পেলেও কোন রকমে বাঁচা যেতো।

ক্ষুধায় সমস্ত রাত ঘুম এলো না কারও চোখে। ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা, এপাশ ওপাশ করে কাটলো দু'জনার। এক সময় অবশ্য চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এলো বনহুরের। আশাও ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন নিজের অজান্তে।

বনহুর জেগে উঠার পূর্বেই জেগে উঠলো আশা। তাকালো চারপাশে, ভোরের আলো ঝলমল করছে চারদিক। পাশে তাকাতেই নজরে পড়লো বনহুর হাতের উপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

আশা ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে গেল বনহুরের পাশে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সে তার মুখের দিকে। ঘুমন্ত দস্যুসম্রাটের বলিষ্ঠ তেজোদ্দীপ্ত মুখখানা আশা প্রাণভরে দেখলো। এ মুখখানা যে তার বড় প্রিয়, বড় কামনার।

এমন সময় গুহার বাইরে শুনতে পেল দ্রুত অশ্বপদশব্দ। আশা বনহুরকে না জাগিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো, লক্ষ্য করলো কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে। ঠিক বুঝতে না পেরে আশা আরও কিছুটা অগ্রসর হলো। শব্দটা

ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। আশা একটা উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, হঠাৎ পিছন থেকে কে বা কারা যেন আশাকে ধরে ফেললো।

আশা ফিরে তাকাবার পূর্বেই তাকে শূন্যে তুলে নিল, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়ে বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরলো। আশা চিৎকার করে ডাকলো—বনহুর...বনহুর...বাঁচাও, বাঁচাও......

ততক্ষণে অশ্বারোহী আশাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

আশার শেষ চিৎকারে বনহুরের নিদ্রা ছুটে গিয়েছিল, সে শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে ছোট্ট গুহাটির বাইরে। সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পায় কিছুদূরে একজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, অশ্বের লাগাম তার হাতের মুঠায়। আরও দেখলো, অপর একজন অশ্বারোহী আশাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কিছুদূরে দন্ডায়মান অশ্বারোহীর পিছনে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর লক্ষ্য করলো, অশ্বারোহী পর্বতের পাদমূলে কারও সন্ধান করছে, দৃষ্টি তার সম্মুখে ছিল। বনহুর আর একদন্ড সময় নষ্ট না করে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো অশ্বারোহীর উপর।

অশ্বারোহী আচমকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নিচে। সে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই বনহুর অশ্বের লাগাম হাতের মুঠায় চেপে ধরে অশ্বের তলপেটে পা দিয়ে আঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটি উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

ততক্ষণে সম্মুখস্থ অশ্বারোহী অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

বনহুর ছুটছে তীরবেগে, যেমন করে হোক আশাকে উদ্ধার করতেই হবে। কে ঐ ব্যক্তি যে আশাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, কি তার উদ্দেশ্য তাই বা কে জানে!

পর্বতমালার পাদদেশ ধরে উল্কার মত ছুটছে দুটি অশ্ব।

বনহুর বুঝতে পারে, যে অশ্বারোহী আশাকে নিয়ে পালাচ্ছে সে টের পেয়ে গেছে তার পিছনে কেউ তাকে পাকড়াও করার জন্য ধাওয়া করেছে, তাই সে তার অশ্বের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকটা কে এবং কি তার উদ্দেশ্য, কোথা থেকেই বা সে এলো আর আশাকেই বা কেমন করে পাকড়াও করলো—সব এলো-মেলো চিন্তা জট পাকাচ্ছে বনহুরের মনে। আরও ভাবছে বনহুর, ঠিক ঐ মুহূর্তে দ্বিতীয়

অশ্বারোহী যদি সেখানে না অপেক্ষা করত তাহলে সে আশার উদ্ধারের চিন্তাই করতে পারত না। অশ্বারোহী আশাকে নিয়ে কোন্ অজানা পথে উধাও হতো, হয়তো খুঁজে বের করা কঠিন হতো তার পক্ষে।

কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে বসে আর কত কি ভাববে সে—তার চিন্তা এখন আশার হরণকারীকে আটক করে আশাকে উদ্ধার করা।

বনহুরের হাতে এখন কোন অস্ত্র নেই। যদি একটি রাইফেল বা পিস্তল থাকত তাহলে সে দূর থেকে অশ্বটির পা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে কাবু করে ফেলতো কিন্তু আজ বনহুর অস্ত্রহীন। বনহুর উল্কার মত ছুটে চলেছে, যেমন করে হোক সম্মুখস্থ অশ্বারোহীকে ধরতেই হবে।

সম্মুখস্থ অশ্বারোহী আশাকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে বাম হাতের মধ্যে আর ডান হাতে সে অশ্বটির লাগাম চেপে ধরে অশ্ব চালনা করছে।

আশার দেহেও অত্যন্ত শক্তি ছিল, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজকে ওর কবল থেকে উদ্ধার করে নেবে কিন্তু কিছুতেই পারল না।

অশ্বারোহী চীনা দস্যু নাংচুর লোক নয়, সে কোন উপজাতি বলে মনে হচ্ছে। যে লোকটিকে বনহুর কাবু করে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছিল সেও উপজাতি ছিল তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু কারা তারা এবং এখানে এলো কোথা থেকে আর আশাকেই বা তারা দেখলো কি করে?

বনহুর এত বেগে অশ্ব চালনা করছিল যে, সম্মুখের অশ্ব কিছুতেই এত দ্রুত এগুতে পারছিল না। পর্বতমালার উঁচুনিচু টিলাপথ ধরে ছুটছে অশ্ব দুটি। অশ্বের খুরের আঘাতে রাশি রাশি ধূলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

বনহুর একটা বড় টিলার পাশ কেটে তীরবেগে এগিয়ে গেল সম্মুখে, একেবারে আগের অশ্বটির পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

সম্মুখস্থ অশ্ব থেমে পড়তে বাধ্য হলো।

বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো অশ্বারোহীর উপর।

অশ্বারোহী আশা সহ পড়ে গেল ভূতলে, আশা ছিটকে পড়লো কিছুটা দূরে এবং গড়িয়ে গেল নিচের দিকে।

বনহুর ভীষণভাবে আক্রমণ করল অশ্বারোহীটিকে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি দু'জনার সাথে।

আশা কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে স্পষ্ট দেখতে পেল বনহুর আর অশ্বারোহীকে। অশ্বারোহী উপজাতি, তার দেহের পোশাক বলতে চামড়ার আলখেল্লা। মাজায় চামড়ার বেল্ট কাঁধের উপর দিয়ে উঠে গেছে।

বলিষ্ঠ চেহারা, মাংসপেশীগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠেছে। মাথায় কোঁকড়ানো রাশিকৃত চুল। চোখগুলো তেমন স্পষ্ট নজরে না পড়লেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি ধরনের, তা ছাড়াও হিংস্র জন্তুর মত তীব্র।

বনহুরকে অশ্বারোহী ছোরা নিয়ে আক্রমণ করলো।

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে হাত চেপে ধরলো অশ্বারোহীর ছোরাসহ হাতখানা—পরক্ষণেই বসিয়ে দিল তার চোয়ালে এক ঘুষি। মাটিতে পড়ে গেল অশ্বারোহী। বনহুর চেপে বসলো ওর বুকে। তখনও অশ্বারোহীর হাতের মুঠায় সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা উদ্যত রয়েছে।

অশ্বারোহী অত্যন্ত ধূর্ত, সে কৌশলে বনহুরকে ফেলে দিল মাটিতে, তারপর দ্রুত চেপে বসলো তার বুকের উপর।

আশার মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে উঠলো। অশ্বারোহী ডান হাতখানা উদ্যত করে ধরেছে, তার হাতের ছোরাখানা ঝকমক করে উঠলো। এই ধার ছোরাখানা বসিয়ে দেবে সে বনহুরের বুকে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো আশা। সে বুঝতে পারল এবার আর বনহুরের রক্ষা নেই, তাকে অশ্বারোহী হত্যা করে ফেলবে। এ দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে। কিন্তু পর মুহূর্তে চোখ থেকে হাত সরিয়ে ফেলতেই মুখমণ্ডল খুশিতে দীপ্ত হল, কারণ বনহুর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

অশ্বারোহীর হাত থেকে ছোরাখানা খসে পড়েছে, কারণ তার গলায় ভীষণ চাপ পড়ায় নাক এবং মুখ দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসেছিল, লোকটা রীতিমত ধুঁকছে।

বনহুর এবার আশার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আশা মুখ লুকালো বনহুরের বুকে।

বনহুর আশার পিঠে হাত রেখে বললো—কোনো ভয় নেই, শয়তানটা শিগগির উঠে পড়তে সক্ষম হবে না। চলো আশা, আমরা এবার যাই।

চলো।

বনহুর আর আশা অশ্বটার পাশে এসে দাঁড়ালো, ঠিক ঐ মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে তার অদূরে পড়ে থাকা ছোরাখানা তুলে নিয়ে উপজাতি লোকটা ছুঁড়ে মারলো বনহুরকে লক্ষ্য করে।

বনহুর আশাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দিয়ে নিজে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসবে, সেই দন্ডে ছোরাখানা এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের পিঠের এক পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ!.....

আশা এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুরের পিঠ থেকে ছোরাখানা একটানে তুলে ফেললো, তারপর ওকে টেনে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে।

এবার আশা বনহুরকে সম্মুখে বসিয়ে নিজে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো তারপর অশ্বের তলপেটে পা দিয়ে আঘাত করলো জোরে।

অশ্ব ছুটতে শুরু করলো।

আশা বললো—বনহুর, না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!

বনহুর বললো—তুমি শীঘ্র ঐ গুহায় ফিরে চলো। নিকটে কোথাও কোন গোপন গুহা নেই........

হাঁ, আমি তাই যাচ্ছি। বললো আশা।

বনহুরের পিঠের জামা রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। ছোরাখানা পিঠে বিদ্ধ হওয়ায় খুব কষ্ট হচ্ছিলো। ক্ষতটা সামান্য নয়, কারণ ছোরাখানা বেশ খানিকটা প্রবেশ করেছিল পিঠের একপাশে।

বললো বনহুর—আশা, দেহটা আমার কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে......জানি না গুহা পর্যন্ত পৌছতে পারবো কিনা।

বনহুর একি হলো......আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। অশ্ব চালনা করতে করতেই কথাগুলো উচ্চারণ করলো আশা।

বনহুর কোন জবাব দিল না, তার মাথাটা ধীরে ধীরে নুয়ে আসছে কারণ অত্যন্ত রক্তপাত হচ্ছিলো তার ক্ষত দিয়ে।

গুহায় পৌছতে বেশি বিলম্ব হল না।

আশা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে বনহুরকে নামিয়ে নিল। যত্ন সহকারে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে। আশার দু'চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। এখন উপায়, যে তাকে রক্ষা করতে এলো সেই কিনা বিপদে আক্রান্ত হলো। আশা যেন দু'চোখে অন্ধকার দেখছে।

বনহুরের ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আশা ভাবলো, এমন অবস্থায় ওকে বাঁচানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। কি করবে সে, নিজের চুলগুলো টেনে ছিঁড়তে লাগল।

বনহুর বুঝতে পারল আশা তার জন্য অত্যন্ত ব্যথাকাতর হয়ে পড়েছে, তাই বললো সে—কিছু ভেবো না, একটু পর আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। আশা, তুমি আমার পাশে বসো।

আশা তার ওড়না দিয়ে বনহুরের ক্ষতটা বেশ করে বেঁধে দিয়েছিল। রক্তে লালে লাল হয়ে উঠেছে ওড়নাখানা।

বনহুরের কথায় আশা তার পাশে এসে বসলো। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল আশার হাতে একবার তীরবিদ্ধ হয়েছিল, তারপর তীরফলা একটানে তুলে ফেলতেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। তখন তার এক অনুচর ছুটে গিয়ে খানিকটা বরফ এনে চাপ দিয়েছিল তার ক্ষতস্থানে, অমনি আশ্চর্য ফল লাভ করেছিল আশা। ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

আশার মনে কথাটা উদয় হতেই সে গুহা থেকে বেরিয়ে ছুটলো বরফ আনতে।

বরফ পেতে হলে তাকে পর্বতগায়ে বেশ কিছুটা উপরে উঠে যেতে হবে। আশা তাই করলো, দ্রুত সে পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা পৌঁছে গেল বরফের পাশে। চাপ চাপ বরফ জমে আছে পর্বতের গায়ে। আশা কিছুটা বরফ সংগ্রহ করে নিয়ে ফিরে এলো।

বনহুর তখন উবু হয়ে পড়েছিল, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে তার ক্ষতস্থানে।

আশা এসে বরফ চাপা দিল বনহুরের ক্ষত জায়গায়।

কিছু সময়ের মধ্যেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আশা বরফ গলিয়ে পানি তৈরি করলো। গুহার পাশেই ছিল একটা শালগাছ। শালগাছের পাতা দিয়ে ঠোঙ্গা বানিয়ে তাতেই বরফ জমিয়ে রেখে দিল, একটু পরে বরফ গলতে শুরু করলো।

দারুণ পিপাসা পেয়েছিল বনহুর আর আশার। প্রাণভরে ওরা দু'জন পানি পান করলো।

বনহুর বললো—আশা, সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী নারী। আমার ক্ষতস্থানে বরফ দিয়ে যে উপকার তুমি করলে তাতে আমার অনেকটা সুস্থ লাগছে। ইনশাল্লাহ সেরে উঠবো তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আশা, এ গুহায় এমন অবস্থায় কতক্ষণ কাটানো যাবে!

যতক্ষণ তুমি সেরে না উঠো বনহুর। কথাটা বললো আশা।

বনহুর বললো—কিন্তু এভাবে কি করে সময় কাটবে বলো? আজ তিনদিন পর সবে পানি পান করলে! তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে আশা।

আমি বেশ আছি, তোমার জন্য আমার সব চিন্তা। আজ অনুতাপ, করছি কেন আমি আমার বিপদের কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম; কেন আমি তোমাকে স্মরণ করেছিলাম বনহুর? আজ আমারই জন্য তুমি কত কষ্ট করলে, আজ তুমি মৃত্যুমুখের যাত্রী……আশার কণ্ঠ ধরে আসে। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর নিজের আংগুল দিয়ে মুছে দেয় ওর চোখের পানি। শান্ত কোমল কণ্ঠে বলে—আশা, বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই তো আমার জন্ম। তুমি দুঃখ কর না, বিপদকে আমি জয় করবই। আজ আমার বড় সান্ত্বনা আশা, তোমাকে নাংচু হুয়াংয়ের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে আনতে সক্ষম হয়েছি।

জানি বনহুর তুমি সংগ্রামী বীর। সংগ্রাম করাই তোমার অভ্যাস……একটু থামলো আশা, তারপর বললো—তোমার জীবনের প্রতিটি কাহিনী আমি জানি আর জানি বলেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। এ পৃথিবীতে তুমিই যেন একমাত্র পুরুষ যার মধ্যে নেই কোন মোহ-লোভ-লালসা।

আশা!

হাঁ বনহুর, শুধু আমিই নই একথা সবাই স্বীকার করবে। আমি শুনেছি, তুমি সাত রাজার ধন মানিক পেয়েও তা সামান্য তুচ্ছ বস্তুর মতই নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেছ! আমি শুনেছি, লক্ষ লক্ষ টাকাও কোনদিন তোমার মনে লালসা আনতে পারেনি। আমি আরও শুনেছি, নীলমনি তুমি হাতে পেয়েও তা গ্রহণ করনি যা পৃথিবীর অমূল্য রত্ন……

আশা, এসব তুমি কি বলছো?

সব আমি জানি বনহুর, আর জানি বলেই তুমি আমার সাধনার বস্তু।

আশা!

নারীর রূপ তোমাকে কোনদিন মোহগ্রস্ত করতে পারেনি, যা কোন পুরুষ কোনদিন পরিহার করতে পারে না।

আশা, সত্যি তুমি এসব বিশ্বাস কর?

যা সত্য তা আমি বিশ্বাস করি বনহুর। আশা ধীরে ধীরে বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে।

❑

একসময় ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

আশা তখনও ওর চুলে হাত বুলিয়ে চলেছে। ভাবছে কত কথা। জানে আশা, বনহুর তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদিও আজ তাকে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছে তবু বহুদূরের মানুষ সে।

কতবার বনহুরের সান্নিধ্য লাভ করেছে আশা, কতবার ওকে প্রাণভরে দেখেছে তবু আরও কাছে পেতে ইচ্ছা করে, আরও প্রাণভরে দেখতে মন চায়। জানে আশা, তাকে কোনদিন সে নিবিড় করে পাবে না। যেমন আকাশের চাঁদকে সবাই ভালবাসে, সবাই কামনা করে, কোনদিন পাবে না জেনেও হতাশ হয় না, তেমনি আশাও জানে ওকে পাবে না, তবু ভালবাসে সে অন্তর দিয়ে।

রাণী দুর্গেশ্বরীর কাহিনী আশা শুনেছিল। সে ছিল এক রাজ্যের মহারাণী। একদিন সে দেখেছিল দস্যু বনহুরকে। শুধু একবার দেখেছিল ওকে, তারপর থেকে রাণী দুর্গেশ্বরীর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর। বহু চেষ্টা করেছিল সে বনহুরকে আপন করে পাবার জন্য, কিন্তু সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছিল। বনহুরকে না পেয়ে দুর্গেশ্বরী উন্মাদিনী হয়ে পড়ে, সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাসিনী হয়......সব জানে আশা। শুধু রাণী দুর্গেশ্বরীর কাহিনীই নয়, এমনি অনেক কাহিনীই আশার জানা আছে। বহু নারীই ওর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু সবাই বিফল হয়েছে, কেউ নিবিড় করে পায়নি ওকে......হঠাৎ একটা শব্দে আশার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে তাকায় আশা, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে থ' মেরে যায়।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে সেই উলঙ্গ এলোকেশী নারীমূর্তি।

আশা ফিরে তাকাতেই নারীমূর্তি সরে গেল গুহামুখ থেকে।

আশা উঠে দাঁড়ালো, বিস্ময়ভরা মন নিয়ে এগিয়ে গেল সে গুহার মুখে। রহস্যময়ী নারী তখন সরে গেছে সেখান থেকে।

আশা গুহামুখে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরের দিকে। দেখতে পেল নারীটি ধীর পদক্ষেপে চলে যাচ্ছে ওদিকে। আশা ভাবলো, বনহুর বলেছিল রহস্যময়ী নারীর আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করবে কিন্তু আজ সে অসুস্থ। শুধু অসুস্থই নয়, জীবনে বাঁচবে কিনা কে জানে। আশা চুপি চুপি অগ্রসর হলো।

রহস্যময়ী নারী তখন পাথর ডিংগিয়ে ডিংগিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আশা চলেছে পিছনে পিছনে— সে দেখতে চায় কোথায় যাবে ঐ নারীটি।

আশা যত এগুচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছে। রহস্যময়ী কিছুটা গিয়ে দু'পায়ে এবং দু'হাতে ভর করে হাটতে শুরু করলো কতকটা হনুমানের মত করে।

আশার মনে আরও বিস্ময়, এ কেমন ধরনের নারী দু'হাতকেও সে পা আকারে ব্যবহার করছে। অনেকদূর এসে পড়ে আশা রহস্যময়ীর পিছু পিছু।

এবার রহস্যময়ী এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, সেখানে বেশ ঘন জঙ্গল ছিল। রহস্যময়ী একটি উঁচু পাথরের উপর এসে দাঁড়ালো, তারপর সে মুখের কাছে হাত নিয়ে অদ্ভুতভাবে এক রকম শব্দ করলো।

আশা একটা টিলার আড়ালে লুকিয়ে দেখছে—দেখছে কি করে সে। আশ্চর্য হলো আশা, রহস্যময়ী মুখ দিয়ে শব্দ করতেই ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটা বিরাট আকারের বানর। বানরটার দেহের চামড়া কুঁচকে গেছে, মুখটা কেমন ঝুলে নেমেছে নিচের দিকে। চোখগুলো আরও ক্ষুদে মনে হচ্ছে।

বানরটা ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতেই রহস্যময়ী এগিয়ে গেল তার দিকে। বানর ওকে কাছে টেনে নিল, কতকটা মা যেমন সন্তানকে বুকে টেনে নেয় তেমনি করে।

রহস্যময়ী বানরের কোলে চেপে বসলো, তারপর ওর বুকে মুখ গুঁজে রইলো কিছুক্ষণ।

বানর রহস্যময়ীর মাথায় বিলি দিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগল। মাঝে মাঝে বানর অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল, তেমনি শব্দ করতে লাগল রহস্যময়ী।

এতক্ষণে আশা বুঝতে পারল বানরটি পুরুষ নয়, মাদী। রহস্যময়ী যেন মায়ের কোলে বসে আছে তেমনি লাগছে ওকে।

বানর আর রহস্যময়ী কিছুক্ষণ কাটলো একত্রে, তারপর বানর টিলার উপর থেকে নেমে এলো নিচে। ওদিকে একটি বেশ বড়সড় গাছ নজরে পড়লো।

বানরী-ঐ গাছটায় উঠে গেল তরতর করে। আশা কিন্তু তখনও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে।

বানরী গাছে উঠে কিছু ফল ছুড়ে ফেলে দিল নিচে ঠিক রহস্যময়ীর দিকে।

রহস্যময়ী ফলগুলো তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিল। রহস্যময়ীর ফল খাওয়া দেখে আশার ক্ষুধা যেন আরও বেড়ে গেল। সে ভাবলো ঐ ফল পেলে সে ক্ষুধা নিবারণ করত। কিন্তু এসময় রহস্যময়ী নারী কিংবা বানরী যদি তাকে দেখে ফেলে তাহলে রক্ষা নেই—মৃত্যু তার অনিবার্য, কারণ রহস্যময়ী শুধু ফলমূলই খায় না, সে মানুষ বা জীবজন্তুও খায়।

আশা তাই অতি কষ্টে নিজের ক্ষুধা দমন করে টিলাটির পাশে আত্মগোপন করে রইলো। সে দেখছে, সব লক্ষ্য করছে নিপুণভাবে। গাছে অনেক ফল আছে পাকা এবং কাঁচা তবে কি ফল সেগুলো বোঝা মুস্কিল।

বানরী অনেকগুলো ফল ছুঁড়ে মারলো নিচে।

রহস্যময়ী ফলগুলো সব কুড়িয়ে নিল না, সে যা সম্মুখে পেল তাই খেতে লাগল কামড়ে কামড়ে। অবশ্য বানরীও গাছে বসে ফল খাচ্ছে তার ইচ্ছামত।

কিছুক্ষণ পর বানরী গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়লো নিচের দিকে, তারপর লাফ দিল টিলার উপরে একেবারে রহস্যময়ীর পাশে এসেছিল।

রহস্যময়ী হাতের অর্ধেক খাওয়া ফলটা ছুড়ে ফেলে দিল, তারপর জড়িয়ে ধরলো বানরীর গলাটা যেমন ছোট্ট বাচ্চা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে তেমনি করে।

বানরী রহস্যময়ীকে আদর করল, তারপর ওর হাত দু'খানাকে নিজের গলা থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে এক লাফে চলে গেল বনের মধ্যে।

রহস্যময়ী কিছুক্ষণ নির্বোধ শিশুর মত চেয়ে রইলো বানরীর চলে যাওয়া পথের দিকে, তারপর সেও টিলার উপর থেকে নেমে চলে গেল বিপরীত দিকে।

আশার সম্মুখে এসে পড়েছিল রহস্যময়ীর আধা খাওয়া ফলটা। আশা ফলটা তুলে নিয়ে কামড়ে খেল। আপন মনেই বলে উঠলো আশা—চমৎকার তো ফলটা!

ভুলে গেল আশা যে ফলটা সে খাচ্ছে সেটা একজনের ভক্ষিত ফল বা নোংরা জিনিস।

ফলটা খেয়ে নিয়ে দ্রুত অন্য ফলগুলো তুলে নিল কোচরে। কোচর ভরে গেল আশার, এবার সে ছুটলো গুহা অভিমুখে।

❑

গোলাপী বৌয়ের দু'চোখে অশ্রুবন্যা বয়ে চলেছে। সেই যে মালেক ভাই গেল আর এলো না। প্রতিদিন ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে সে। কত কথা মনে পড়ে গোলাপী বৌয়ের, ভাবে বাড়ি গিয়ে মালেক ভাইয়ের কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো? কিন্তু কে দেবে তার জবাব!

মনে তার কত কথা, কত ব্যথা গুমড়ে মরে তবু সে কাউকে কিছু বলতে পারে না। কাকেই বা সে বলবে মনের কথা—এ বাড়িতে কেই বা তার আপনজন আছে? স্বামী সেও বদ্ধপাগল, একটু স্নেহ-মমতার জন্য লালায়িত গোলাপী বৌ।

শ্বশুর ইকরাম আলীর আচরণে ভীষণ ব্যথিত সে। শুধু ব্যথিত নয়, তার জীবন আজকাল দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শহর থেকে বড় বড় নামকরা লোকজন আসে। আজকাল ইকরাম আলী গোলাপী বৌকে বাধ্য করে তাদের সম্মুখে যেতে—কখনও চা-নাস্তার ট্রে হাতে কখনও পান-সুপারি জর্দার বাটাসহ। গোলাপী বৌকে দেখে স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ আড়চোখে তাকায়, মুগ্ধ হয় তারা।

অবশ্য ইকরাম আলী পুত্রবধুর আসল পরিচয় গোপন করে তাকে বাড়ির ঝি বলেই চালিয়ে নেয়। স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ নানারকম কুৎসিত ইংগিত করতেও ছাড়ে না। কেউ বা টিপ্পনি কাটে নানা ধরনের।

গোলাপী বৌ অবুঝ নয়, সে সব বোঝে—নীরবে চোখের পানি ফেলে সে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় পালাবে সে এ বাড়ি থেকে; কিন্তু কোথায় যাবে, এ পৃথিবীতে কেউ যে তার আপনজন নেই! দিশেহারা গোলাপী বৌ তাই মাটি কামড়ে পড়ে থাকে এ বাড়িতেই।

মালেক মিয়া এসেছিল, বড় দরদ করত তাকে। ক'মাস বেশ ছিল গোলাপী বৌ। তবু মনে করত একজন আছে—সে তাকে স্নেহ করে ভালবাসে। মালেক ভাই চলে যাবার পর থেকে সে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে। এ বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তাকে এতটুকু সহানুভূতি জানায়।

সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করেও নিস্তার ছিল না ওর, রাতেও ধান ভানতে হতো তাকে। যদিও গ্রামেই ধান ভানার কল ছিল, তবু ইকরাম গৃহিণী বাড়িতেই ধান ভানত, কারণ অমন যোয়ান পুত্রবধুকে বসে বসে কে খাওয়াবে?

নির্দয় ইকরাম গৃহিণীর মনে পড়লো না এতটুকু দয়া-মায়া-স্নেহ। সে পুত্রবধুর এতটুকু বিশ্রাম বরদাস্ত করতে পারত না। রাতে ঘুমাবে তাও সহ্য হতো না তার, তাই সমস্ত রাত ধান ভানত গোলাপী বৌকে দিয়ে।

গোলাপী বৌয়ের দুঃখের সীমা নেই।

রাত যখন তিন প্রহর তখন ফুরসত মিলতো গোলাপী বৌয়ের। একলা নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবতো কত কথা। ঐ মুখখানা ভেসে উঠতো তার মনে—আর কেন আসে না সে?

কিন্তু কেউ তার হৃদয়ের ব্যথা বুঝতো না, বুঝতো না তার মনের কথা।

ইকরাম আলীর ব্যবসা আরও ফেঁপে উঠেছে। গ্রামের সমিতির ছেলেরা তার ব্যবসায় বাধা দিতে এলে শাসিয়ে দেয় ইকরাম আলী—খবরদার, আমার কাজে বাধ সাধতে এসো না তোমরা, দুস্কৃতিকারী বলে ধরিয়ে দেব। জান নতুন আইন জারী হয়েছে— দুস্কৃতকারীদের ক্ষমা নেই।

ছেলেরা যত দুঃসাহসীই হোক না কেন, ঘাবড়ে যায় ইকরাম আলীর কথা শুনে, কারণ ইকরাম আলীর আনাগোনা স্বনামধন্য মহলে, কাজেই তারা সহসা ইকরাম আলীর কাজে বাধা দিতে পারে না। সমিতির কাজ বেশ চলছিল, অনেক দুঃস্থ গ্রামবাসী এখানে পরিশ্রম করে অন্নের সংস্থান করে কিন্তু ইকরাম আলীর চক্রান্তে আজ সমিতির কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। মালেক মিয়া অনেক সময় হিত পরামর্শ দিত, সেও নেই। সমিতির ছেলেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে যেন।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন হয়। দেশের অবস্থা কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে। টাকা যার আছে, তার আরও টাকা আসছে—টাকা যার নেই সে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ অভাব রাক্ষসীর কবল থেকে রক্ষার কোন উপায় নেই তার।

হাজরা গ্রামে যারা মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল তারা দেশের এই দারুণ অবস্থার শিকার হয়ে দাঁড়ালো।

ইকরাম আলী জানিয়ে দিয়েছে জমিতে যার যা ধান জন্মেছে তার তিন ভাগ দিতে হবে সরকারকে—তবে বিনা পয়সায় নয়, উচিত মূল্যে।

হাটে-বাজারে এবং বাড়িতেও এই ধান কেনা শুরু হলো।

ইকরাম আলীর বাড়িতে সব ধান মজুত হবে, তারপর যাবে শহরে সরকারের গুদামে। সরকারের লোকজন সবসময় ইকরাম আলীর বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

ইকরাম আলী গ্রামের সবাইকে ডেকে বলে দিয়েছে, যে সরকারের কথা অমান্য করবে তাকে উচিত সাজা দেয়া হবে। এসব ধান-চাল সরকার মজুত করে রাখবেন দেশের দারুণ সঙ্কট মুহূর্তের জন্য, কাজেই ধান-চাল না দেয়া দেশদ্রোহীর কাজ। সরকারের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কার আছে!

গ্রামবাসীরা যার যা ধান-চাল জমিতে ফলেছিল তারা বয়ে নিয়ে হাজির হলো ইকরাম আলীর বাড়ির সম্মুখে।

সার্ট-কোট-টাই পরা কয়েকজন লোক এসেছে শহর থেকে। একখানা মোটরও দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার দক্ষিণ পাশে। ঐ মোটরেই এসেছে ভদ্রলোকগুলো, এরা নাকি কান্দাই সরকারের লোক।

হাজরা গ্রামবাসীদের অনেকের ঘরেই ধান জন্মেছে সত্য কিন্তু এমন কোন বেশি নয় যা তাদের সংসারের খরচ চালিয়ে বাঁচবে। এমন কি, অনেকের বছরের খোরাক হবে কিনা সন্দেহ তবু বাধ্য হলো তারা ধান-চাল বয়ে আনতে।

সবার মুখের হাসি মুছে গেছে, কারণ ধান-চাল না দিলে রক্ষা নেই, বাধ্যতামূলক এসব বিচিকিনি চলেছে।

কথাটা কানে গেল সমিতির ছেলেদের।

শাহীনুর, ঠান্ডা, ইকবাল, মখলেছুর, সুজা আর জোবায়েদ সবাই গোপনে মিটিং ডাকলো। সেখানে লাকী, লেবু, শিরীন, সাহারা বানু, পারভীন, লায়লা, পারুল সবাই সমবেত হলো।

সমিতির লাইব্রেরী রুমে মিটিং বসলো।

অত্যন্ত গোপন মিটিং. কারণ ইকরাম আলী আজকাল যেভাবে তাদের পিছু লেগেছে তাতে তারা দেশ ও দশের কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম হচ্ছে না, বরং সমিতির কাজেও তারা প্রতি পদক্ষেপে নানা রকম বাধা-বিপত্তি পেয়ে আসছে।

শাহীনুর বললো— আজ যদি মালেক ভাই থাকত তবে আমাদের এখন কি করা কর্তব্য সে বাতলে দিত।

মোখলেছুর বললো—সে যখন নেই তখন সবকিছু চিন্তা আমাদেরই করতে হবে। ইকরাম আলীর বাড়িতে যে সব সরকারি লোক এসেছে. ন্যায্যমূল্যে ধান-চাল ক্রয় করতে, তারা সত্যি সরকারি লোক কিনা এবং এসব চাল-ধান সত্যি সত্যি সরকারের গুদামে যাবে কিনা, দেখা দরকার।

বললো এবার ঠান্ডা—ঠিক বলেছ মোখলেছুর ভাই। প্রথমে আমাদের দেখা দরকার লোকগুলো সত্যিই সরকারের লোক কিনা। যদি তারা আসল লোক হয় এবং এসব ধান-চাল সত্যিই সরকারের গুদামে যায় তবে তারা পরিত্রাণ পাবে......

ঠান্ডার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো সুজা—নইলে ওদের সবাইকে আমরা কি করব? •

বললো এবার জোবায়েদ—যে ধান-চাল ওরা হাজরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিনেছে, আরও কিনছে তা ওদের ধরে খাওয়াব।

একসঙ্গে সবাই হেসে উঠলো হো হো করে।

বললো লাকী—চুপ কেউ শুনে ফেলবে! জান তো, ইকরাম আলীর গুপ্তচর সব সময় আমাদের সমিতির আনাচে-কানাচে ঘুরে ফিরছে।

শিরীন বললো—পিছু যখন লেগেই আছে তখন ভয় কি? আমরাও কম কেউটে নই, বুঝলি লাকী? সরকারের লোক নাম ধারণ করে দেশে কতগুলো শয়তান সাধুর মুখোস পরে দেশবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে।

এখানে যখন হাজরা সমিতির কক্ষে তরুণ আর তরুণীদের মধ্যে মিটিং হচ্ছিলো তখন ইকরাম আলীর বাসভবনেও গোপন বৈঠক হচ্ছিল। বৈঠকে ছিল ইকরাম আলী ও তার কয়েকজন সহচর এবং ছিল সরকারের লোক নামধারী নর শয়তানের দল, যারা হাজরার অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস হরণ করে চলেছে।

বললো ইকরাম আলী—একমাত্র হাজরা গ্রাম থেকেই আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার মণ চাল আর দশ হাজার মণ ধান সংগ্রহ করে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। হাজরার জনগণ জানে এসব ধান-চাল সরকারের গুদামে জমা হবে, কিন্তু......কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো ইকরাম আলী।

যারা বসেছিল তারাও হাসিতে যোগ দিল।

ইকরাম আঁলী হাসি থামিয়ে ফেললো চট করে, তারপর বললো—আমার জন্য আপনারা কতটুকু করব জানি না, তবে আপনাদের জন্য যথেষ্ট করছি।

সরকারের লোক হিসেবে যে সব ছদ্মবেশী অফিসার আসর জমিয়ে তুলেছিল তাদের একজন বললো—আপনার সঙ্গে যে চুক্তি আছে তার এক কানাকড়িও কম দেব না আমরা আপনাকে।

হাঁ, কম দেব কেন, আর দিলেই বা নেবো কেন বলুন? আমি যেভাবে কাজ করছি তাতে আপনারা বিরাট লাভবান হবেন তাতে কোন ভুল নেই এবং আমিও চাই কিছু লাভবান হতে। দেখুন মিঃ মকবুল হোসেন, কাল হাটে কেমন চাতুরির সঙ্গে ধান ও চালের বাজার এক মিনিটে কমিয়ে নিয়ে এলাম।

এ জন্যই তো আপনার এত কদর ইকরাম আলী সাহেব। আপনার মত সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তির চাহিদা সব সময়ই আছে।

হাঁ আর একটি কথা, হাজরা পুলিশ মহল যদি আপনাদের আসল পরিচয় জানতে পারে?

ইকরাম আলীর কথায় বললেন মিঃ হোসেন—পুলিশ মহলের মুখ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি আলী সাহেব। তাঁরা আমাদের কাজে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, কারণ·····গলাটা একটু খাটো করে নিয়ে বললেন—কারণ তাঁদের পকেট পূর্ণ করে দিয়েছি আমরা।

তার মানে? কতকটা অবুঝের মত বলে উঠে ইকরাম আলীর বড় শ্যালক জবান আলী।

ইকরাম আলী বললো—এ সহজ কথাটা বোঝ না জবান, পুলিশদের পকেট পূর্ণ করে দিয়েছেন এনারা মানে—ঘুষ, বুঝলে এবার?

ও বুঝেছি—তা ঠিক, পুলিশ মহলের পকেটে কিছু পড়লেই বাস্········।

অপর একজন বললো—এ ছাড়া উপায় কি তাদের। দেশের যা অবস্থা তাতে যতবড় চাকরীজীবীই হোক না কেন, মাইনের টাকাতে সংসার চালানো মানে চোখে অমাবস্যার অন্ধকার দেখা। কাজেই যদি দু'চারটে কিছু পকেটে পড়ে তাতে না করতে পার না—যত কর্তব্যপরায়ণ অফিসারই হোন না কেন, চুপ মেরে যান। দেখেও না দেখার ভান কর কিংবা বুঝেও না বোঝার অভিনয় কর।

বললো হোসেন সাহেব—কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত, কি বলেন?

হাঁ, ঠিক বলছেন হোসেন সাহেব, নিশ্চিন্তই বটে আমরা। দেশের সব রসাতলে গেছে আরও যাচ্ছে শুধু বেঁচে থাকব আমরা ব্যবসায়ী দল……কথাটা বলে হাসলো হোসেন সাহেবের সহকারী ইদরিস উদ্দিন।

ইকরাম আলী তার ফুরসী হুকোয় শেষবারের মত টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—শুধু ব্যবসায়ী বলবেন না, যাদের জমি আছে তারাও কম লাভবান হচ্ছে না, কারণ জমির ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে যত, তত তারা লালে লাল হচ্ছে।

মিঃ হাকিম, সেও নকল সরকারি লোকদের একজন, বললো—দেশের জমিওয়ালা, ব্যবসায়ী আর যারা স্বনামধন্য ব্যক্তি—এ তিন শ্রেণীর লোক শুধু বেঁচে থাকবে আর সব মরে যাবে, মিশে যাবে পথের ধূলোয়।

ঠিক বলেছ মিঃ হাকিম, আপনার কথাটা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সত্য। হাঃ হাঃ হাঃ, শুধু তিন শ্রেণীর লোক বাঁচবে আর সবাই মরে যাবে, মিশে যাবে পথের ধূলায়………হাঃ হাঃ হাঃ……

একসঙ্গে চমকে ফিরে তাকালো সবাই। তারা অবাক হয়ে দেখলো, দেহে জমকালো ও মুখে মুখোশ পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, হাতে তার উদ্যত রাইফেল।

ইকরাম আলী বললো—কে…কে তুমি?

অন্যান্য সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে যেন, তারা থ' মেরে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

জমকালো মূর্তি বললো—আমাকে চিনতে পারছ না, কারণ বেশ কিছুদিন আসতে পারিনি।

তুমি তুমি……তুমি……ইকরাম আলীর কণ্ঠ থেমে যায়।

জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—হাঁ, আমি তোমার সেই বন্ধু যে বন্ধুকে তুমি বারবার উপেক্ষা করেছ।

তুমি সেই ডাকাত?

হাঁ, তবে তোমাদের মত প্রকাশ্য ডাকাতি করি না। আমি ডাকাতি করি রাতের অন্ধকারে আর তোমরা কর……যাক্ বেশি বিলম্ব করতে পারবো না এখন, শোন তোমরা যে শলাপরামর্শ নিয়ে এখানে আলোচনা করছ তা বন্ধ করে দাও। বন্ধ করে দাও চাল এবং ধান কেনা—দেশের সম্পদ তোমরা দেশে থাকতে দাও।

বললো ইকরাম আলী—আমরা যা করছি তা দেশের মঙ্গলের জন্য করছি। যে চাল-ধান আমরা ক্রয় করছি তা সরকারি গুদামে মজুত থাকবে এবং যখন দেশে খাদ্যশস্য ঘাটতি দেখা দেবে তখন এসব চাল-ধান সরকার দেশের জনগণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করবে।

জানি। সব জানি আমি কিন্তু কোন চালাকি চলবে না। দেশের সম্পদ তোমরা এভাবে লুটে নিতে পারবে না। জমকালো মূর্তি বললো কথাটা।

ইকরাম আলীই জবাব দিল—তুমি ডাকাত। এসেছো ডাকাতি করতে, কিন্তু এসব কথা কেন বাবা? যত টাকা চাও আমরা দেব। কি বলেন হোসেন সাহেব?

হাঁ হাঁ, যা চাও তাই দেব। পুলিশের মুখ বন্ধ করেছি, এবার ডাকাতের মুখ বন্ধ করতে যা লাগে লাগুক। কথাগুলো বললো হোসেন সাহেব।

জমকালো মূর্তি বললো—না, আমি ডাকাতি করতে আসিনি। চাই না কিছু কিন্তু সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, দেশের ধান-চাল চোরাচালানী হয়ে যেন বাইরে না যায়। কথাটা বলে বেরিয়ে গেল জমকালো মূর্তি। জমকালো মূর্তি চলে যেতেই ইকরাম আলী চিৎকার করে ডাকলো—ডাকাত, ডাকাত! কোথায় কে আছ, ডাকাত পড়েছে।

চারদিক থেকে ছুটে এলো লোকজন সবাই। কিন্তু ডাকাত তখন উধাও হয়েছে।

❑

সমিতি কক্ষে বসেছিল ওরা।

ঠান্ডা এসে দাঁড়ালো, তার দেহে জমকালো পোশাক, একটানে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল সে দেহের আলখেল্লাটা।

মোখলেছুর বললো—কিরে ঠান্ডা, ফিরে আসতে পারলি?

ঠান্ডা গম্ভীর গলায় বললো—কার সাধ্য আমাকে আটকায়। শয়তানের দলকে ঘাবড়ে দিয়েছি, ওরা বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

শাহীনুর ঠান্ডার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—সাবাস ডাকু ভাই, যদি শয়তানের দল তোকে চিনতে পারত তখন কি হতো?

হতো আবার কি, রাইফেল হাতেই ছিল, সবাইকে সাবাড় করে দিয়ে আসতাম।

বলিস্ কি ঠান্ডা!

হাঁ, খতম না করে ছাড়তাম না বেটাদের। তবে যদি ওরা আমার কথা না শোনে তাহলে আবার হানা দেব, তখন সত্যি সত্যি ডাকাত বনে যাব দেখিস্। তবে লুটতরাজের জন্য নয়, উদ্দেশ্য হবে আমার দেশের যারা শত্রু তাদের নিপাত করা।

সাবাস্। বললো মোখলেছুর।

সাহারা বানু বললো—ঠান্ডা ভাই, তুমি যত সহজ ভাবছ কাজটা তত সহজ নয় কিন্তু।

কেন? বললো ঠান্ডা।

সাহারা বানু বললো—ইকরাম আলীর হাতেও অনেক ষন্ডাগুন্ডা আছে, তাদের লেলিয়ে দিয়ে তোমাকে সে ঠান্ডা করে দেবে।

সাহারা বানুর কথা শুনে হাসলো সবাই।

ঠান্ডা বললো—যত ভাবছ তত নয়। আমি শপথ নিয়েছি, যারা দেশ ও দশের শত্রু, তাদের আমরা নিপাত করবই। জান মোখলেছুর ভাই, ইকরাম আলীর সহায়তায় চোরাকারবারী দল সরকারি লোক সেজে দেশের হাটবাজার থেকে ধান-চাল সব স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে নিচ্ছে। তাছাড়াও জনগণকে ভয় দেখিয়ে তাদের বাড়ি থেকে খোরাকির ধান-চাল জোরপূর্বক কিনে নিচ্ছে। সরল-সহজ জনগণ, তারা মনে করছে ওঁরা বুঝি দেশের মঙ্গলের জন্যই এ কাজে এগিয়ে এসেছে। তাই গ্রামবাসীরাও এসব অসাধু ব্যবসায়ীকে সহায়তা করে চলেছে.........কিন্তু আমরা এমন জঘন্য অন্যায় অনাচার করতে দেব না।

ইকবাল বললো—আমরা গোপনে সব সময় লক্ষ্য রাখব কোথায়, কোন্ হাটবাজারে ওরা চাল ক্রয় করে, তারপর মজাটা কেমন দেখাব।

জোবায়েদ বললো—একটা কথা আমি বলছি শোন, এরা সত্যিই সরকারের লোক কিনা এবং তারা সত্যি এসব চাল-ধান সরকারের গুদামে মজুতের জন্য কিনছে কিনা, ভালভাবে খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার, নাহলে মস্ত ভুল করা হবে।

মোখলেছুর বললো—জোবায়েদ, তুই এ কথা বলছিস্! পাগল আর কি, আমরা ঠিকভাবে খোঁজ নিয়ে তবেই কাজে লেগেছি। সরকারের লোক যদি

হবে তবে তারা ইকরাম আলীর বাড়িতে বসে গোপন বৈঠক করবে কেন? তা ছাড়াও শহরে গিয়ে সঠিক সংবাদ আমরা জেনে নিয়েছি, এরা কেউ সরকারের লোক নয়।

সুজা বলে উঠলো—যাই বলো মোখলেছুর ভাই, এরা সরকারের লোক না হলেও এমন কোন ব্যক্তির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে, যার পিছনে আছে বিরাট শক্তি, না হলে এমন সাহস পায়?

তা অবশ্য সত্যি, এসব শয়তানের পিছনে আছে শয়তানের বাবারা, যারা দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। মোখলেছুরের কথায় হেসে উঠলো সবাই।

এবার বললো শাহীনূর—মোখলেছুর ভাই, শুনলাম শিমুলবাড়ি হাটেও নাকি একদল লোক সাত সকালে গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকে। গ্রামের লোকজন হাটে আসতে না আসতেই ধান-চাল কেনাকাটা সমাপ্ত হয়ে যায়, তারপর তারা ধান-চাল নিয়ে কোথায় চলে যায় কেউ জানে না। তবে সবাই জানে, এসব ধান-চাল সরকারের গুদামে যাচ্ছে। এটা সত্য কিনা জানা নিতান্ত দরকার।

মোখলেছুর বললো—হাঁ, শিমুলবাড়ি আমাদের লোক পাঠিয়েছি। গোপনে তারা সন্ধান নিয়ে আমাকে জানাবে যারা শিমুলবাড়ি হাটে ধান-চাল কিনছে তারা সত্যিই সরকারি লোক কিনা। যদি সরকারের লোক হয় তাহলে রক্ষা পাবে, নইলে তাদেরও সমুচিত শাস্তি দেব আমরা। দেশের এ চরম মুহূর্তে আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না......

ঠিক ঐ মুহূর্তে সমিতি কক্ষের পেছন থেকে সরে গেল এক ব্যক্তি, অন্ধকারে আত্মগোপন করে শুনছিল সে ছেলেদের কথাবার্তা।

লোকটা যে কোন শয়তান দলের চক্রী বা গুপ্তচর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকটা সোজা অন্ধকারে আত্মগোপন করে এসে হাজির হলো ইকরাম আলীর বাড়িতে।

ইকরাম আলী বসে বসে কিছু হিসাব নিকাশ করছিল, লোকটা সোজা এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে, ডাকলো—আলী সাহেব!

ইকরাম আলী হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল—কে হবু মিয়া?

হাঁ। আলী সাহেব, আমি এখন পশ্চিমপাড়া সমিতি থেকে আসছি।

কি সংবাদ হবু মিয়া?

সমিতির পিছনে লুকিয়েছিলাম, ওরা কেউ জানতে পারে নি······সবাই গোপনে আলাপ-আলোচনা করছিল।

কি শুনলে তুমি?

আপনার বাড়িতে যে ডাকাত এসেছিল সে সত্যিকারের ডাকাত নয়।

তবে সে কে?

সমিতির এক ছেলে।

সমিতির ছেলেরা ডাকাত হয়েছে! হাঁ, আমি জানতাম এরা কোনদিন ভালমানুষ হবে না। স্কুল-কলেজে পড়ে সবাই চোর-ডাকাত, আর বদমাইশ হয়েছে। ওরা সব দুস্কৃতিকারী······

হাঁ, ঠিক বলেছ—ওরাই দুস্কৃতিকারী, ওরাই দেশের অপদার্থ, যতসব অন্যায় অনাচারের চাবিকাঠি। জান আলী সাহেব, ওরা সব সময় আমাদের কাজে বাধা দিয়ে আসছে······

হবু মিয়া?

বলুন আলী সাহেব?

আজ থেকে তোমার কাজ সমিতির ছেলেদের প্রতি গোপনে লৃক্ষ্য রাখা এবং তাদের সব কথা আমাকে জানিয়ে দেয়া। তারপর বাছাধনদের সবাইকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় দেখিয়ে দেব।

আচ্ছা আলী সাহেব, আপনার কথামত আমি সমিতির ছেলেদের উপর এখন থেকে নজর রাখব।

নজর নয়—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তা রাখবে গোপনে। কথাটা শেষ করে খাতায় মনোযোগ দিল ইকরাম আলী।

❑

বনহুর সম্পূর্ণ সুস্থ্ হয়ে উঠলো।

তবে কয়েকটা দিন তাকে শুয়েই কাটাতে হলো। আশা প্রতিদিন সেই বৃক্ষতল হতে ফল নিয়ে আসত, তা-ই বনহুরকে খেতে দিত এবং সে নিজেও খেত।

ফলগুলো ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু, কাজেই বনহুর ও আশা প্রতিদিন তৃপ্তি সহকারে ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত।

বনহুর যখন একেবারে সুস্থ তখন বললো আশা—জান বনহুর, আমি রহস্যময়ী নারীর জীবন কাহিনী উদঘাটন করেছি।

বনহুরের চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—সত্যি বলছ আশা?

হাঁ সত্যি।

কি করে এ কঠিন কাজ তুমি সমাধা করলে?

তোমাকে নিজের চোখে দেখাব। এসো আমার সঙ্গে……আশা বনহুরের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো।

গুহার বাইরে এসে তাকালো আশা আকাশের দিকে। সম্মুখে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, কারণ পর্বতমালার পাদমূলে অসংখ্য বৃক্ষলতার ঝোপঝাড় রয়েছে। মাথার উপরে আকাশের চাঁদোয়ায় খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা চলছে। বললো আশা—বনহুর, আজ আমি বড় আনন্দ বোধ করছি। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবো, আমি ভাবতে পারিনি। কেন জানি না মনে আমার সব সময় একটা দুশ্চিন্তা তোলপাড় করত, হয়তো তুমি আর আরোগ্য লাভ করবে না। কে যেন কানে কানে বলতো, ওর মৃত্যুর জন্য তুমিই হবে দায়ী……।

হেসে উঠলো বনহুর—তোমার মনের দুর্বলতাই তোমার কানে কানে বলতো আশা, কারণ…….যাক, তা না শোনাই ভাল! সত্যিই নারীজাতি মা-ভগ্নি-জায়া হবার উপযুক্তই বটে। আমি নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি……

আশা চলতে চলতে ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। সে মুখে অপূর্ব এক দীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। আশা বললো—বনহুর, তুমি মহৎ মহান, তাই নারীজাতিকে তুমি শ্রদ্ধা কর, ভালবাস। এ পৃথিবীতে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা নারীজাতিকে শুধু ভোগেরই সামগ্রি মনে করে, মনে করে নারী শুধু পুরুষদের হাতের খেলনা।

একটুকরা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে—সে কথা অবশ্য সত্য কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের দেশের সমাজ। নারীজাতিও যে পুরুষের সমান অধিকারী তা আমাদের দেশের সমাজ স্বীকার করে না, আর করে না বলেই নারীজাতি দিন দিন পুরুষের হাতের খেলনা বনে যাচ্ছে। একটু থেমে বললো আবার বনহুর—এবং সে কারণেই নারীমন হয়ে পড়ছে দুর্বল। তারা মনে করে, আমরা অক্ষম, কিন্তু এ ভুল ধারণা নারীজাতির মন

থেকে অচিরেই দূর হবে। তারা বুঝতে পারবে, নারীজাতিও পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—তারাও সব পারে। পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা তাদের দ্বারা হয় না, হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে কোন অসাধ্য কাজ তারা সমাধা করতে পারে, তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ তুমি নিজে।

বেশি বাড়িয়ে বললো বনহুর।

না, মোটেই বাড়িয়ে বলিনি। আশা, অনেক সময় নির্জনে তোমার কথা ভাবি। অবাক হয়ে যাই তোমার জীবনকাহিনী স্মরণ করে।

যাক্ সে সব পুরান কথা……বনহুর, জান এই নির্জন পর্বতের পাদমূলে শুধু আমরা দু'জন হেঁটে চলেছি। তুমি পুরুষ, আমি নারী…….কিন্তু তোমার পাশে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। সত্যি তুমি কি বলতে পারি না………

কারণ, আমি তোমার বন্ধু!

বনহুর!

হাঁ আশা।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলে ওরা।

হঠাৎ উভয়ে চমকে উঠে, দূরে একটা শব্দ হয়। যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়েছিল পাশে কোথাও। বনহুর আর আশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আশা বললো—দেখ দেখ………

বনহুর তাকালো সম্মুখে, দেখতে পেল একটা বিরাট বানর চার পায়ে ভর করে হাঁটছে। বানরটি তাদের দেখতে পায়নি, কারণ বানরের কাছ থেকে তারা কমপক্ষে একশ' গজ দূরে এবং নিচে ছিল।

বানরটিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো আশা—বনহুর, এ বানরটি একটি মানব-শিশুর মাতা।

মানে?

মানে সেই রহস্যময়ী নারীর জননী।

আমি ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

চুপ করে ঐ বানরটিকে লক্ষ্য করে যাও, দেখতে পাবে সবকিছু এবং তুমি যা জানতে চেয়েছিলে তাই জানতে পারবে। ঐ দেখ বানরটি কেমন তাকাচ্ছে চারদিকে। কি খুঁজছে জান? ওর কন্যার সন্ধান করছে।

বলো কি আশা, ঐ বানরটি রহস্যময়ী নারীর জননী!

হাঁ, তবে হয়তো ঠিক নিজ জননী নয়, পালিতা মাতা। আর ওটি পুরুষ বানর নয়, মাদী বানর। ঐ যে আসছে রহস্যময়ী নারী.........দেখ বানরী কেমন শব্দ করছে।

বানরী তার কন্যাকে দেখে অদ্ভুত শব্দ করছিল। বারবার সে মাথাটা দোলাচ্ছিলো, হয়তো সে ডাকছিল রহস্যময়ীকে।

বনহুর আর আশা একটা পাথরখণ্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

রহস্যময়ী নারী তার বানরী মাতাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়কর শব্দ করে উঠলো, যেমন শব্দ করছিল বানরীটা।

বানরী বৃদ্ধা। তাকে দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারণ তার দেহের চামড়া ঝুলে নেমেছে। দেহের লোমগুলো কিছু কিছু খসে পড়েছে দেহ থেকে।

রহস্যময়ী দু'হাত এবং দু'পায়ে ভর করে হাঁটছিল। এগিয়ে আসছিল সে বানরীর দিকে। বানরী একটা উঁচু পাথরখণ্ডে বসে তাকাচ্ছিলো রহস্যময়ীর দিকে। পিঠটা কুঁজো হয়ে পড়েছে বানরীর। চোখ দুটো পিট পিট করছে, ভ্রুগুলো ঝুলে গিয়েছে। রহস্যময়ীকে দেখে বানরী স্নেহময়ী জননীর মত আড়াভরা দৃষ্টি নিয়ে।

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময়। সে জানতে চেয়েছিল ঐ রহস্যময়ী নারীর জীবন রহস্য, তাই সে গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে চললো।

আশা অবশ্য পূর্বে আরও দু'চার বার এ দৃশ্য দেখেছিল, তাই সে এ দৃশ্য লক্ষ্য করলেও তেমনভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল না বরং সে দেখছিল বনহুরকে। বললো আশা—রহস্যময়ী দু'হাত আর দু'পায়ে ভর করে কেমন হাঁটছে দেখ, যেন সেও একটা বানর।

হাঁ তাই, আসলে ও মানুষ হয়েও সব সময় বানরের সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং সে কারণেই ও আজ বানরে পরিণত হয়েছে। কথাগুলো বললো বনহুর।

আশা বললো—তোমার কি মনে হয় নারীটিকে ঐ বানরীই মানুষ করেছে?

সম্পূর্ণ সত্য। ঐ বানরীর কোলেই সে বড় হয়েছে। যার জন্য আজ একেবারে বানরী বনে গেছে। জান আশা, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, কারণ বানর আর মানুষে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আজ বুঝতে পারছি, ঐ রহস্যময়ী নারী বন-জঙ্গল এবং জীবজন্তুর মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে,

তাই সে মানুষ হয়েও অমানুষ। কথা বলার ফাঁকে বনহুর তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছিলো রহস্যময়ী নারী ও বানরীটিকে।

রহস্যময়ী নারী নিকটবর্তী হতেই বানরী ওকে টেনে নিল কাছে, ওর গালে-মুখে হাত বুলিয়ে মুখে মুখ রেখে চুমু খেলো।

রহস্যময়ী তখন বানরীর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

বনহুর বললো—অদ্ভুত দৃশ্য! আশা, সত্যিই বানরী ওর জননী তাতে কোন সন্দেহ নেই—তবে ওর পালিত মাতা, গর্ভধারিণী নয়।

আশা বললো—হাঁ, তাই হবে। তবে আশ্চর্য, মেয়েটি এই নির্জন পর্বতের পাদমূলে এলো কি করে? এবং বানরীই বা তাকে কিভাবে পেল?

হাঁ, সেটাই এখন ভাববার বিষয়। যদিও রহস্যময়ীর পালিত মাতা ঐ বানরী কিন্তু আসলে সে মানুষের সন্তান। কে ওর বাবা-মা, এখন হয়তো খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

আচ্ছা, ঐ অমানুষ মেয়েটিকে কি আর সভ্য করে তোলা যায় না?

বনহুর বললো—যায়, কারণ সে সত্যই বানর নয়—সে মানুষ। তাই তাকে কিছুদিন সভ্যসমাজে রাখলে এবং নানাভাবে তাকে শিক্ষা দিলে ধীরে ধীরে মানুষের কার্যকলাপ অনুকরণ করবে এবং করতে শিখবে।

কথা বলার ফাঁকে তারা উভয়ে লক্ষ্য করছিল বানরী আর রহস্যময়ীকে। রহস্যময়ী বানরীর কোলে মাথা রেখে হেলান দিয়ে বসলো।

ধীরে ধীরে ওর চুলে বিলি দিতে লাগলো বানরী। মাঝে মাঝে উকুন তুলে নিয়ে মুখে পুরছে সে। যেমন বানরীরা একজন অপর জনের দেহের লোম থেকে উকুন তুলে নিয়ে মুখে পুরে।

বললো বনহুর—মেয়েটি একেবারে জানোয়ার বনে গেছে। আচ্ছা আশা, তুমি একটা কাজ করতে পারবে? অবশ্য আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।

বলো কি কাজ?

কাজ অত্যন্ত কঠিন, তবে তুমি ইচ্ছা করলে সহজ হবে। আশা, ঐ রহস্যময়ী নারীটিকে তুমি তোমার মত সভ্যসমাজের একজন নারী হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে?

বনহুর, আমারও সেই ইচ্ছা, ঐ জানোয়াররূপী নারীটিকে আমরা সভ্যসমাজে নিয়ে গিয়ে সভ্য করে তুলি।

তুমি পারবে আশা?

পারবো।

যদি পার তবে আমি ওকে কৌশলে আটক করব এবং তুলে দেব তোমার হাতে।

বনহুর, আমি তোমার সাহায্য পেলে খুশি হব।

সত্যি আশা?

হ্যাঁ।

বনহুর আর আশা যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন বানরী এবং তার পালিত কন্যা রহস্যময়ী পাথরখণ্ডটির উপর থেকে নেমে চলেছে ওদিকে ফলপূর্ণ বৃক্ষটির দিকে।

বনহুর বললো—চলো আশা, আমরা গুহায় ফিরে যাই।

চলো। বললো আশা।

গুহায় ফিরে উভয়ে পাশাপাশি বসলো। এখন তাদের চিন্তা কেমন করে ঐ অমানুষ নারীটিকে মানুষে পরিণত করা যায়।

বললো আশা—ওকে পাকড়াও করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে না হয়? নরখাদক নারী যে--------

আশা, তুমি যদি আমাকে সহায়তা কর তবে আমি পারবো, আমি যাবো ওর সম্মুখে।

সর্বনাশ যদি সে তোমাকে আক্রমণ করে বসে? যা হিংস্র·········নরমাংস খাওয়া তার স্বভাব। তা'ছাড়া কোন রকম দড়ি বা কাঠের বাক্স নেই যার মধ্যে আটকানো যাবে।

এসব তৈরি করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। পর্বতের গায়ে বহু লতাগুল্ম আছে, ঐসব দিয়ে সুন্দর রশি বা দড়ি তৈরি করে নিতে পারবো। আশা, ওকে বাগে আনতে হলে বেশ কিছুদিন আমাদের এই পর্বতের নির্জন গুহায় কাটাতে হবে, তোমার তেমন কোন অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা হলেই বা কি উপায় আছে, কি করে আমরা ফিরে যেতে পারি? না আছে কোন যানবাহন কিংবা জাহাজ বা নৌকা! একপাশে সুউচ্চ পর্বতমালা আর একপাশে বিশাল সমুদ্র।

আরও একটি পথ আছে যে পথে আমরা এখানে এসেছিলাম। সে পথ হলো পর্বতের ভিতর দিয়ে একটি দুর্গম সুড়ঙ্গপথ।

আশা বলে উঠলো—হাঁ, ঠিক মনে পড়ছে—ওরা যখন আমার চোখ বেঁধে আমাকে নিয়ে আসে তখন আমার মনে হচ্ছিলো কোন সুড়ঙ্গপথ দিয়েই আমাকে ওরা নিয়ে আসছে। কারণ, মাঝে মাঝে আমি হোচট

খাচ্ছিলাম এবং দেয়ালের মত কিছু জিনিসের সঙ্গে বারবার মাথা ঠুকে যাচ্ছিলো। দু'চোখ আমার জমকালো কাপড়ে বাঁধা ছিল, তাই কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হাঁ, এবার ঠিক বুঝতে পারছি ঐ পথেই চীনা দস্যু নাংচু-হুয়াং তোমাকে তার দুর্গম বন্দীশালায় বন্দী করেছিল। আশা, ঐ পথেই আমরা যেতে পারবো। তবে পথ দীর্ঘ, তাই অপেক্ষা করছি আমার হিন্দল ঘাটির অনুচরদের কেউ আসে কিনা। আমার সঙ্গে যে ক্ষুদ্র ওয়্যারলেস যন্ত্রটি ছিল তা হারিয়ে গেছে, নইলে আমাদের উপস্থিতি সংবাদটা আমার আস্তানায় জানাতে পারতাম তবে হায়দার নিশ্চয়ই আসবে, হয়তো পথ ভুল করেছে সে, নয় কোন কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

বনহুরের অনুমান মিথ্যা নয়, হায়দার আলী হিন্দলে ফিরে এসে সর্দারের কথামত জম্বু গিয়ে পৌছে। জম্বুতে তাদের যে আস্তানা ছিল সেখানে গিয়ে রামসিংকে সব কথা বলে সে, জানায় সর্দারের নির্দেশ।

আস্তানার রত্নগুহায় আটক করে রাখা হয়েছিল জম্বুর মহান নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের, যারা জম্বুর হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিল এক সময়। বনহুর এই মহান নেতাদের আটক করেছিল, তাদের কার্যকলাপের চরম পুরস্কার হিসেবে তাদের রত্নগুহায় বন্দী করে রেখেছিল যাতে তাঁরা রত্ন খেতে পারে। যে ধন-সম্পদ আর রত্নের জন্য তাঁরা দেশের অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল সেই ধন-সম্পদ আর রত্ন তাদেরকে দিয়েছিল প্রচুর, যত খুশি নেবে এবং খাবে কিন্তু তারা ঐ সব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না, সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল বনহুর।

হায়দার আলী যখন সরদারের নির্দেশ অনুযায়ী জম্বু ঘাটিতে এলো এবং জম্বুর রত্নগুহায় প্রবেশ করলো তখন দেখলো, জম্বুর মহান অধিপতিরা যারা দেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে পুতুল খেলা খেলতো তারাই এখন নিজেদের ভাগ্য নিয়ে তিল তিল করে ধুঁকে মরছে। সবারই দেহের বসন ছিন্নভিন্ন নোংরা মলিন। মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো, মুখে কাঁচাপাকা দাঁড়ির স্তূপ। দেহের স্থুল মাংসপেশীগুলো শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে চামড়া কেটে বসেছে। অদ্ভুত এ দৃশ্য!

হায়দার আলীকে দেখে জম্বুর ভাগ্যবিধাতাগণ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, তারা বললো—আমাদের এমনভাবে বন্দী করে না রেখে মেরে ফেলো তোমরা, তবু আর কষ্ট দিও না.........

হায়দার আলী বললো—কষ্ট…কিসের কষ্ট? আপনাদের চারপাশে রয়েছে স্তূপাকার স্বর্ণ-রৌপ্য আর অর্থ—তবু কষ্ট? ওঃ, বহুদিন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করতে পারেনি। প্রতিদিন মূল্যবান পোশাকে দেহ সজ্জিত থেকে বঞ্চিত আছেন। কুইন কারে চেপে ভ্রমণ করতে পারছেন না, পারছেন না বিলেতী হুইস্কি পান করতে। তাছাড়া কতদিন দাড়ি-গোঁফ কামানো হয়নি—সত্য বড় কষ্ট বটে! এ ছাড়া টেবিল চেয়ারে বসে সাহেবী খানাও ভাগ্যে জোটেনি অনেকদিন—শুধু স্বর্ণ খেয়ে তৃপ্ত নন, তাইনা?

হায়দার আলীর কথায় বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকেন জম্বু অধিপতিগণ। হায়, একদিন যাদের আংগুল হেলনে দেশের কাজকর্ম চলতো আজ তারাই কিনা একমুঠো অন্যের জন্য লালায়িত।

রামসিং বললো—আপনাদের হত্যা করে মুক্তি দিতে পারি না আমরা—মুক্তি দিতে পার আমাদের সর্দার বনহুর।

দস্যু, বনহুর!

হাঁ, তিনিই আপনাদের মুক্তি দিতে পার।

কোথায় সে?

এখন তিনি জম্বুর বাইরে।

বললো হায়দার—আপনারা এরই মধ্যে মৃত্যু কামনা করছেন? আর যারা আপনাদের নির্মম নিষ্ঠুর আচরণে দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়েছে, তারা কি করে বছরের পর বছর কাটিয়েছে এবং কাটাচ্ছে? না আছে তাদের আশ্রয়—না আছে পরনে বস্ত্র না আছে ক্ষুধায় অন্ন…আপনারা কোনদিন কি তাদের কথা ভেবে দেখেছেন তারা কেমনভাবে দিন কাটায়? এ পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু যেন শুধু আপনাদের। আপনারাই সব আনন্দ উপভোগ করতে চান? তা হয় না, এ পৃথিবী সবার জন্য—পৃথিবীতে সবার সমান অধিকার আছে। আপনারা একাই পৃথিবীর সব আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পার না। ছিনিয়ে নিতে পার না অসহায় মানুষের মুখের হাসি। চুপ করে আছেন কেন, জবাব দেন?

মহান অধিপতিরা শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে তাজা করে নেবার বৃথা চেষ্টা করছিল, কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ বনে গেছে এক এক জনের। একজন বললো অতি কষ্টে—আমরা নিজেদের পরিশ্রমে পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছিলাম। কোন অসহায় মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নিতে চাইনি……..

তবে চেয়েছেন নিজেরা পেট পুরে খাবেন, গাড়ি হাঁকাবেন আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন। আর একদল আছে যারা খেতে পাবে না, আপনাদের গাড়ির তলায় তারা চাপা পড়বে আর খোলা আকাশের তলায় ঘুমাবে........রোদে পুড়ে, ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে.........

সেটা তাদের কর্মফল। বললো আর একজন মহান অধিনায়ক।

কি বললেন, সেটা তাদের কর্মফল? আপনারা যে ইমারতে বাস করেন তা কাদের পরিশ্রমে তৈরি? আপনারা যে গাড়িতে ভ্রমণ করেন তা কারা তৈরি করে? যে খানা আপনারা খান তা আসে কোথা থেকে? জবাব দিন......এসব কাদের দেহের রক্তের দান, বলুন?

এবার নীরব হয়ে থাকে মহান অধিপতিরা। একজন হাউ-মাউ করে কেঁদে বলে—আর সহ্য হয় না—যা হয় কর তোমরা, এভাবে আর শুকিয়ে মেরো না।

হা হা করে হেসে উঠে রামসিং আর হায়দার আলী, তারপর হাসি থামিয়ে বলে রামসিং—একটু পূর্বেই বলেছ কর্মফল মানুষকে ভোগ করতে হয়, কাজেই আপনারা যেমন কর্ম করেছেন এখন তার ফল ভোগ করুন। প্রথমেই বলেছি, আমরা হত্যা করে কোন পাপীকে পাপ থেকে মুক্তি দেই না।

হায়দার আলী বললো—আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন, কান্দাই যেতে হবে। সেখানে বিচার হবে আপনাদের। রামসিং, এদের নিয়ে তুমি কান্দাই আস্তানায় চলে যাও। আমি হিন্দল অভিমুখে রওনা দেব। সর্দার যদি ফিরে এসে থাকেন তবে ভাল, নয় আমাকে যেত হবে সেই চীনা দস্যু নাংচুহুয়াংয়ের দুর্গম বন্দীশালায়।

রামসিং বললো—আচ্ছা, তোমার কথামত আমি এই মহান অধিপতিদের নিয়ে কান্দাই রওনা দেব।

হায়দার আলী বেরিয়ে গেল আর রামসিং বন্দীদের নিয়ে কান্দাই অভিমুখে রওনা দিবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

হায়দার আলী আর রামসিং বিদায় নিলে জম্বু অধিপতিগণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। একজন বললো—না জানি এরপর ভাগ্যে আরও কি আছে!

❑

গভীর জঙ্গলে একান্ত নির্জনে বনহুরকে পেয়ে বড় ভাল লাগে আশার। সব কষ্ট ভুলে যায় সে—ফল খেয়ে এভাবে ক'দিন বাঁচবে, সে কথা বিস্মৃত হয় আশা।

ভাবে আশা, ওকে যদি এমনি করে চিরদিনের জন্য সে কাছে কাছে পেত! কিন্তু সে বাসনা তার সফল হবে না জানে, তবু মন চায় ওকে একান্ত আপন করে নিতে।

সেদিন আশা বসেছিল একা একা একটি পাথরখণ্ডে, ভাবছিল বনহুরের কথা। বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আকাশে হাল্কা মেঘগুলো শুভ্র রাজহংসীর মত ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। পিছনে পর্বতের দেয়াল, আশেপাশে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো পাথরখণ্ডের স্তূপ। সম্মুখে দৃষ্টি যতদূর যায় শুধু ঝোপ ঝাড় আর জঙ্গল।

বনহুর সেই যে সকালে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি, কোথায় গেছে জানে না আশা, তাই মনটা বড় অস্থির লাগছে ওর। তাকে না বলে সে তো কোন সময় তার দৃষ্টির আড়ালে যায় না, আজ হঠাৎ কোথায় গেল! এই নির্জন পর্বতের পাদমূলে কোথায় কোন্ বিপদ ওৎ পেতে আছে কে জানে। কোন বিপদে পড়েনি তো সে? আশার মনটা যেন অস্থির হয়ে উঠলো। আর বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না, এবার আশা উঠে দাঁড়ালো, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল সে, কিন্তু কোথাও নজরে পড়ছে না।

এক পা দু'পা করে এগুতে লাগল সে পাথরখণ্ড ডিংগিয়ে ডিংগিয়ে। কিছুদূর এগুতেই দেখতে পেল একটা টিলার পাশে বসে বসে কি যেন করছে বনহুর।

আশা থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো।

বনহুর বসে আছে, সম্মুখে রাশিকৃত লতাপাতার স্তূপ, কি যেন করছে সে।

আশা অতিলঘু পদক্ষেপে বনহুরের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো—এখানে কি করছ শুনি?

বনহুর হেসে বললো—ফাঁদ তৈরি করছি।

ফাঁদ?

হাঁ।

কিসের ফাঁদ আর কি জন্যই বা ফাঁদ তৈরি করছ?

বনহুর মাথা নিচু করে কাজ করছিল, মুখ তুলে তাকালো এতক্ষণে। আশার মুখে দৃষ্টি রেখে বললো—ফাঁদ লতাগুল্ম দিয়ে তৈরি করেছি, উদ্দেশ্য রহস্যময়ী নারীটিকে পাকড়াও করা।

আশা হেসে বললো—আমি ঠিক তাই অনুমান করেছিলাম।

আশা, রহস্যময়ীকে পাকড়াও করে তোমার হাতে ওকে সমর্পণ করতে চাই, কারণ তুমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলে ওকে অমানুষ থেকে মানুষ করা যায় কিনা।

হাঁ বনহুর, আমার ঐ রকম বাসনা আছে, তবে জানি না ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরূপী নারীটিকে সভ্য করতে পারবো কিনা।

জানি তুমি পারবে, আর সেই কারণেই আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছি।

বনহুর আর আশা কথা বলছিল, ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছনে নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি জেগে উঠলো।

চমকে না উঠলেও আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালো বনহুর আর আশা। তারা দেখলো, একটা সুউচ্চ টিলার উপরে দঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত রমণী। তার রাশিকৃত এলো চুল বাতাসে উড়ছে, হাত দু'খানা সম্মুখে প্রসারিত করে হাসছে সে খিল খিল করে।

বনহুর সেদিকে তাকিয়ে আশাকে বললো—এ সুযোগ আমি নষ্ট করতে চাই না আশা। রহস্যময়ীকে আমি আজই পাকড়াও করতে চাই।

পারবে?

নিশ্চয়ই পারবো যদি তুমি আমায় সাহায্য কর।

আমি প্রস্তুত আছি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে, বলো কি করতে হবে?

এই যে লতাগুল্ম আছে, এর নীচেই আছে গর্ত আর রয়েছে লতার শিকল। আশা, আমি ঐ টিলার এপাশ থেকে ফল ছুড়ে মারবো ঠিক এই গর্তটার ওপাশে। তুমি ঐ লতার শিকলটার একপাশে ধরে রাখবে মজবুত করে। ফলগুলো ঠিক গর্তের ওপাশে গিয়ে পড়বে, রহস্যময়ী যেমনি ফল দেখে গর্তটার ওপাশে যেতে চেষ্টা করবে তখনই সে পড়ে যাবে গর্তটার

মধ্যে। জান আশা, এমনভাবে ফাঁদ তৈরি করে রেখেছি রহস্যময়ী ফাঁদে না আটকে যাবে না। যেমনি সে গর্তে পড়ে যাবে অমনি তুমি লতার শিকল টান দেবে।

চমৎকার বুদ্ধি করেছ বনহুর! কিন্তু ফল পেলে কোথায়?

গাছ থেকে পেড়ে এনেছি। এসো দেখবে এসো……

না থাক।

তাহলে যা বললাম মনে আছে?

আছে, তুমি যাও ফলগুলো ছুঁড়ে মারো গিয়ে।

বনহুর চলে গেল ওপাশে, তাকে আর মোটেই দেখা যাচ্ছে না। এবার আশাও আত্মগোপন করলো টিলার এপাশে।

রহস্যময়ী তখন টিলার ধারে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তবে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তার গলার অদ্ভুত শব্দ।

হঠাৎ একটা ফল এসে পড়লো গর্তের পাশে।

বনহুর ফলটা ছুঁড়ে মেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলটা এসে গড়িয়ে পড়লো টিলার ধারে।

আশা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে গর্তটার দিকে।

পর পর কয়েকটা ফল এসে গড়িয়ে পড়ল কিন্তু কোথায় রহস্যময়ী, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সে চলে গেছে?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

রহস্যময়ী ঐ দিকে না এসে অপরদিকে চলে গেছে। দূরে অনেক দূরে শোনা গেল সেই অদ্ভুত হাসির শব্দ।

বনহুর বেরিয়ে এলো, বিমর্ষ তার মুখমণ্ডল। এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্য তখনকার মত।

আশাও বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে।

বললো আশা—রহস্যময়ী চলে গেছে।

হাঁ, তার বানর মাতার পিছনে পিছনে সে চলে গেল।

তুমি দেখেছ?

হাঁ আশা, আমি দেখলাম বানরী যেভাবে হাঁটছে সেই রহস্যময়ীও ঠিক সেইভাবে হাঁটছে দু'পায়ে এবং দু'হাতে ভর করে। সত্যি বিস্ময়কর এ নারী। চলো আশা ফিরে যাই, আবার আসবো।

পরদিন আবার এলো আশা আর বনহুর।

ওরা ওৎ পেতে বসে রইলো রহস্যময়ীর আগমন আশায় কিন্তু সেদিন আর রহস্যময়ী এলো না।

দু'দিন কেটে গেল।

তিনদিন পর আশা আর বনহুর ঐ টিলার দিকে পা বাড়ালো।

বনহুর বললো—আর ধৈর্য রাখা যায় না আশা। হয়তো আমার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে, কারণ রহস্যময়ী কোনদিনই এ গর্তের ধারে আসবে না।

আশা নীরবে এগুচ্ছিলো, সে জানে বনহুর যা বলছে সত্য—ঐ রহস্যময়ীকে পাকড়াও করা দুঃসাধ্য বটে।

উভয়ে টিলার পাশে এসে দাঁড়াতেই অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে এলো তাদের কানে। ঠিক গর্তের মধ্য থেকে শব্দটা ভেসে আসছে—সেই রহস্যময়ীর কণ্ঠের আওয়াজ!

বনহুরের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো সে—আশা, আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

আশা বললো—এ শব্দ রহস্যময়ীর কণ্ঠের না?

হাঁ, তারই এ কণ্ঠ।

এই গর্তে পড়ে গেছে সে?

শুধু গর্তে পড়েই যায়নি ফাঁদে আটকে গেছে, আর সে গর্ত থেকে উঠতে পারছে না।

ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো?

গর্তের উপরে আমি ঘাস-লতাগুল্ম দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম, সে যেন বুঝতে না পারে এখানে কোন গর্ত আছে। যাক, আমার প্রচেষ্টা তাহলে সার্থক হলো। আশা, তুমি খুব শক্তভাবে এই লতার শিকল এঁটে ধরো, আমি ওপাশের লতার দড়ি যেটা ফাঁদ আকারে তৈরি করেছি সেটা ধরে টেনে তুলছি।

তাই কর; কিন্তু ওকে কিভাবে পাকড়াও করে রাখবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

অবশ্য মুস্কিল আছে, তবে আপাততঃ লতার শিকল বা লতার দড়ি ব্যবহার করতে হবে। যাও শিকলটা শক্ত করে এঁটে ধর। এমনিভাবে ধরবে। বলে বনহুর লতার শিকলটা আশার হাতের মুঠায় গুঁজে দেয়।

বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে আশার মনে শিহরণ জাগায়, এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে তার হৃদয়, নির্বাক হয়ে তাকায় সে ওর মুখের দিকে।

বনহুরের তখন কোন দিকে খেয়াল নেই। তার চিন্তা রহস্যময়ীকে বন্দী করা—ওকে কিভাবে আটক করা যায়, সেই ভাবনায় অস্থির সে। আশার হাতের মুঠায় লতার শিকলটা গুঁজে দিয়ে ওপাশে চলে যায় বনহুর।

গর্তের এপাশে আশা।

বনহুর লতার ফাঁদটার আগা ধীরে ধীরে টেনে তুলতে থাকে উপরের দিকে। ফাঁদে আটকা পড়েছে রহস্যময়ী, তাতে কোন ভুল নেই। অত্যন্ত ভার মনে হচ্ছে লতার রশিটা।

বনহুর বললো—আশা, সাবধানে রশি ধরে টেনে তুলবে! আমি চাই ওকে এপাশে তুলতে, কারণ তুমি হয়তো ওর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

আশা বললো—আচ্ছা, আমি তাই করব।

আশা লতার শিকল ধরে টানতে লাগল।

ওদিকে বনহুর টেনে তুলে এনেছে প্রায়। রহস্যময়ীর ঠিক মাজায় ফাঁদ এঁটে গেছে। ফাঁদটা মজবুতভাবে বসে গেছে, কাজেই পড়ার কোন ভয় নেই।

বনহুর যতই টেনে তুলছে ততই রহস্যময়ী ফাঁদ থেকে নিজকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করছে। দু'পাশে তার পাথরের দেয়াল, নিচে গভীর খাদ। ফাঁদ থেকে খসে পড়লে রহস্যময়ীর মৃত্যু ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুর তাই কৌশলে ধীরে ধীরে ওকে টেনে তুলছিল।

ঠিক যখন গর্তের মুখে এসে পড়েছে রহস্যময়ী, তখন সে দেখতে পেল বনহুরকে। বনহুরকে দেখামাত্র রহস্যময়ী অদ্ভুতভাবে চিৎকার শুরু করলো, সে বুঝতে পেরেছে তাকে কেউ ধরে ফেলেছে কিংবা ধরবার চেষ্টা করছে।

বনহুর তখন প্রাণপণে লতার শিকল ধরে টেনে তুলে আনে উপরে। রহস্যময়ী নারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, উপরে তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলো।

ঝটপট করছে ওর দেহটা, কারণ মাজায় রয়েছে লতার তৈরি মজবুত ফাঁদ, কিছুতেই রহস্যময়ী ফাঁদ থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারছে না।

মাটিতে যতই সে গড়াগড়ি দিচ্ছে ততই ফাঁদের লতার দড়ি কষে বসছে মাজায়।

ওদিকে এসে পড়েছে আশা, সে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—সাবধান, ওর নখগুলো দেখেছো কেমন ধারালো। হঠাৎ যদি ছাড়া পায় রক্তারক্তি করে ফেলবে ও।

বনহুর লতার দড়ি সহ রহস্যময়ীকে উপরে টেনে তুলতে গিয়ে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিল, এখন হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললো—জানোয়ারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়েছে মেয়েটা। রশি দিয়ে ওকে কৌশলে বেঁধে ফেলতে হবে।

কিন্তু কি করে বাঁধবে বনহুর, যে ভয়ঙ্কর দেখছি ওকে!

উপায় একটা করতে হবে। দেখ কিভাবে দাঁত দিয়ে লতার দড়ি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আশা, তুমি দড়ির আগাটা মজবুত করে ধরে থাক, আমি ওকে পিছন দিক থেকে বেঁধে ফেলবো।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি তোমাকে আক্রমণ করে?

তবু উপায় একটা করতে হবে তো?

বনহুর আশার হাতে ফাঁদের দড়িটা দিয়ে হাতের জামা গুটিয়ে নেয়, তারপর পিছন দিক দিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে।

রহস্যময়ী তখন উঠে বসে দাঁত দিয়ে ফাঁদের লতাগুলো কেটে ফেলতে চেষ্টা করছিল।

বনহুর ওকে ধরে ফেলে শক্ত করে পিছন থেকে। এমনভাবে ধরেছে একচুল নড়তে পারে না রহস্যময়ী। ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের পায়ে জড়িয়ে পড়ে একটা লতার আগা। বনহুরের হাতখানা একটু শিথিল হয়ে যায়, অমনি রহস্যময়ী আক্রমণ করে তাকে।

দু'হাতে খামচে ধরে বনহুরকে। এত শক্তি রাক্ষসী রমণীর দেহে আশ্চর্য হয় বনহুর।

রাক্ষসী রমণী যখন বনহুরের দেহে কামড়ে দিতে গেল তখন বনহুর ওর দু'খানা হাত পিছমোড়া করে ধরে ফেললো। এবার একচুল নড়বারও ক্ষমতা রইলো না রহস্যময়ীর।

বনহুর যখন অদ্ভুত রমণীটাকে কৌশলে বেঁধে ফেললো তখন আশা অবাক না হয়ে পারল না, কারণ কারও সাধ্য ছিল না ওকে হাতে-নাতে আটক করে। নারী হলেও সংঘাতিক ছিল সে।

রহস্যময়ীকে বেঁধে ফেলতেই সে বন্দিনী সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। দু'হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল সে।

আশা শুধু বিস্মিতই নয় হতবাক হয়ে গেছে, রহস্যময়ী নারীকে বনহুর এত সহজে বন্দী করতে পারবে—সে কথা যেন ভাবতেই পারেনি আশা, অবাক চোখে দেখছে সে।

বনহুর বললো—একে প্রথমেই আয়ত্তে আনা মুস্কিল, কাজেই ধীরে ধীরে কাবু করে আনতে হবে, তারপর……

বনহুরের কথা শেষ হয় না, পিছনে শোনা যায় বানরীর তীব্র হুঙ্কার। বানরী কি করে জানতে পেরেছে তার প্রিয় কন্যাটি আটকা পড়েছে, তাই সে ভীষণ তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে।

আশা বললো—বনহুর, দেখেছ বানরী কেমন হন্য হয়ে উঠেছে। মনে হয় আর একটু হলেই সে আমাদের আক্রমণ করে বসতো।

বনহুর বললো—আপাততঃ আমাদের সরে যাওয়া দরকার। দেখা যাক্ বানরী কি করে।

হাঁ, তাই চলো। বললো আশা।

বানরী তখন অদ্ভুতভাবে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর আর আশা লুকিয়ে পড়লো একটা টিলার আড়ালে।

বানরী আশেপাশে কাউকে না দেখে চার পায়ে ভর করে নেমে এলো নিচে পাথরখন্ডে, লাফ দিয়ে একেবারে এসেছিল মানবী-কন্যার পাশে।

মানবী-কন্যাটি তার পালিতা জননীকে দেখে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো কিন্তু তার হাত দু'খানা মজবুত করে পিছনে বাঁধা থাকায় সে কিছুতেই বানরীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারল না।

বানরী কিন্তু বারবার তার মানবী-কন্যার গালে-মুখে চুমু দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। কখনও বা গলায়, মাথায় চুমু দিয়ে কন্যার ব্যথা লাঘব করার চেষ্টা করছে।

বানরী-মাতার ভাব দেখে বনহুরের মনে মায়া হলো। বললো বনহুর—সত্যি, নারী-হৃদয় মমতায় ভরা—তার প্রমাণ ঐ বানরী। দেখছ না পালিতা কন্যার জন্য ও কেমন হন্য হয়ে উঠেছে।

হাঁ, তাই! বানরী-মাতার অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে।

তাহলে রহস্যময়ীকে মুক্ত করে দেই, কি বলো?

না না, তা হয় না। আমি ওকে সভ্যসমাজে নিয়ে গিয়ে মানুষে পরিণত করব। বড় সখ আমার বনহুর, তুমি আমাকে সহায়তা করবে যেমন আমি তোমাকে সহায়তা করছি।

ধন্যবাদ আশা, তোমার কথা শুনে খুশি হলাম।

বনহুর আর আশা যখন বিস্ময় নিয়ে বানরী-মাতার কার্যকলাপ দেখছিল তখন বানরী-মাতা হঠাৎ কন্যাকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল দূরে। কোথায় যাচ্ছে বোঝা গেল না প্রথমে।

কিছু সময় কাটতে না কাটতে বানরী ফিরে এলো, তার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটা বানর জট পাকিয়ে এসেছে। বানরী আর অন্য বানরগুলো এসে ঘিরে ধরলো মানবী বানরীটিকে।

সবাই কিচির মিচির করছে কিন্তু কেউ রহস্যময়ীর দেহের ফাঁস খুলে ফেলতে সক্ষম হলো না।

এক সময় বনহুর আর আশা বানরী ও তার দলবলের দৃষ্টি এড়িয়ে ফিরে এলো নিজেদের গুহায়। সেদিন আর বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারল না ওরা সেখানে, কারণ প্রচন্ড শীতে দেহের রক্ত জমে যাবার উপক্রম হলো তাদের।

গুহায় ফিরে এসে আগুন জ্বালালো বনহুর।

আশা অবসর সময়ে কিছু শুকনো কাঠ আর শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে রেখেছিল। সমস্ত দিন রোদে রোদে কাটালেও রাত যেন কাটতে চায় না। তীব্র শীত শরীরের রক্ত জমিয়ে দেয় একেবারে। এ জন্যই আশা শুকনো ডালপালা দিনের আলোতে কুড়িয়ে জমা করে রাখে।

বনহুর পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালে। যেমন সে যুগে ছিল আগুন জ্বালার পদ্ধতি।

অন্যান্য দিনের মত আগুন জ্বেলে দু'পাশে দু'জন বসলো। হাত-পা বরফ বনে যাবার উপক্রম হয়েছে। আগুনের তাপে হাত পা গরম করে নিতে লাগল বনহুর আর আশা।

বললো আশা—আমাদের দেহে জামা-কাপড় রয়েছে, তদুপরি আগুন কুন্ডের পাশে বসেও শীতে জমে যাবার অবস্থা···আর বেচারী রহস্যময়ী নারী, সত্যি ওর না জানি কত ঠান্ডা লাগে!

একটু হেসে বললো বনহুর—আমাদের দেহে যেমন শীত বোধ হয় ওর দেহে তেমন হয় না, কারণ ওর ছোটবেলা কিংবা শিশু অবস্থা থেকে জামা-কাপড়ের ছোঁয়া দেহে লাগেনি, কাজেই জন্তুদের মতই শীত-বৃষ্টি-বাদল সহ্য করার ক্ষমতাও রহস্যময়ীর আছে।

কিন্তু এই রাত……তীব্র ঠান্ডায় বাঁচবে তো?

সেটা ওর ভাগ্য।

বড় অদ্ভুত বিস্ময়কর কান্ড—বানরী গিয়ে কিভাবে দলবলকে ডেকে আনলো! বানরী আর বানরগুলো মিলে মানবীকন্যাকে রক্ষার কত না চেষ্টা চালাচ্ছে।

হাঁ আশা,. বানরদের একতা বড় আশ্চর্য, ওরা কোন সময় কোন বিপদে পড়লে সবাই মিলে দলবদ্ধ হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে।

সে রাত তাদের চোখে ঘুম এলো না। বারবার ঐ রহস্যময়ীর কথাই তাদের মনে উদয় হচ্ছিলো। পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর বললো—আশা, আজ আমরা কি অবস্থায় রহস্যময়ীকে দেখবো কে জানে।

দারুণ শীতে মারাও পড়তে পারে। বললো আশা।

বনহুর আর আশা যখন এসে সেই টিলাটির পাশে উপস্থিত হলো তখন বিস্ময়ে থ' হয়ে ছিল তারা। বানরী তার মানবী-সন্তানকে বুকের নিচে রেখে আরামে ঘুমাচ্ছে।

রহস্যময়ী ঠিক ছোট শিশুর মত কুঁকড়ে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে আছে বানরীর বুকের মধ্যে।

বনহুর বললো—আর বিলম্ব করা উচিত হবে না আশা, এ সুযোগ আমাকে গ্রহণ করতে হবে। বানরীকে ঘুমন্ত অবস্থায় বেঁধে ফেলতে হবে, তারপর ওর মানবী-সন্তানকে পাকড়াও করতে হবে। আশা, এসো আমার সঙ্গে, এই মোটা লতার শিকলটা সঙ্গে নাও। এই লতার শিকল দিয়ে বানরীকে মজবুত করে বেঁধে ফেলবো।

বনহুর সেদিন কয়েকটা লতার শিকল তৈরি করে রেখেছিল।

আশা একটা লতার শিকল হাতে তুলে নিল।

বনহুর আর আশা চললো টিলাটির দিকে।

বানরী-মাতা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ভোরের মিষ্টি রোদে ঘুম জমে উঠেছে বানরী-মাতার, তার সঙ্গে মানবী-সন্তানের ঘুমও গাঢ় হয়ে উঠেছে। যদিও হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা আছে রহস্যময়ীর, তবু সে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর আর আশা অতি সন্তর্পণে বানরী-মাতার পিছনে এসে দাঁড়ালো। বনহুর মুখে আংগুল দিয়ে আশাকে চুপ থাকার জন্য ইংগিত করে লতার তৈরি শিকল হাতে নিল এবং বানরীর গলায় পরিয়ে দিল।

বানরী সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো।

কিন্তু বানরী জেগে উঠার পূর্বেই দ্রুত পায়ে আশা সহ বনহুর লুকিয়ে পড়লো টিলার আড়ালে।

ততক্ষণে বানরীর গলায় লতার শিকল এঁটে বসে গেছে। কিছুতেই সে গলা থেকে শিকল খুলে ফেলতে পারছে না। ক্রমেই আরও জড়িয়ে পড়ে বানরীর দেহে ফাঁদটা।

ঐ সময় হঠাৎ কানে ভেসে আসে অশ্ব পদশব্দ।

আশা এবং বনহুর কান পেতে শুনলো, দু'জনের চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ।

আশা বললো—নিশ্চয়ই সেই লোক যারা ক'দিন পূর্বে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল। কেমন ভয় লাগছে আমার।

বনহুর কোন জবাব দিল না, কারণ সে জানে ওরা কত সাংঘাতিক, কতটা জানোয়ারের মত ভয়ঙ্কর। অবশ্য একটুও ঘাবড়ে গেল না সে, বরং কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল।

এদিকে বানরী আর রহস্যময়ীকে নিয়ে ভীষণ এক সমস্যা, কারণ যেমন করে হোক রহস্যময়ীকে পাকড়াও করতেই হবে। আবার ওদিকে অশ্বারোহীদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছে বনহুর। কিন্তু কারা আসছে, তারা নাও হতে পারে তো। বনহুর তাই সহজ হয়ে দাঁড়ালো, যদি বিপদ আসে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছে সে।

সেখান থেকে সরে এমন একস্থানে এসে দাঁড়ালো বনহুর, যেখান থেকে বহুদূর দৃষ্টি চলে যায়। অল্প সময়েই নজর পড়লো অশ্বারোহীদের উপর। মুহূর্তে বনহুরের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

অশ্বারোহীরা অন্য কেউ নয়—রহমান আর রামসিং। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসে তাকাচ্ছে চারদিকে। বুঝতে পারে বনহুর তারই সন্ধান করছে ওরা।

আশা অবশ্য রহমানকে চিনতো—রামসিংকে চিনতো না, তবু সে অনুমান করে নিল বনহুরেরই অনুচর হবে। আশাও বনহুরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—এরা তোমার অনুচর বলে মনে হচ্ছে?

হাঁ, এরা একজন রহমান ও অপরজন রামসিং। আশা, আমরা বিপদমুক্ত হয়েছি। এবার বানরী-মাতার কাছ থেকে তার মানবী-সন্তানকে আমরা সরিয়ে নিতে পারবো বলে আশা করছি।

ওদিকে বানরী-মাতা ভীষণভাবে ঝটপট শুরু করে দিয়েছে।

তেমনি রহস্যময়ীও নিজ দেহের বন্ধন খসিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বনহুর হাত উঁচু করে নাড়তে লাগল।

রহমান ও রামসিং দেখে ফেললো তাকে। তার পাশে আশাকেও দেখলো।

রহমান ও রামসিংয়ের মুখমন্ডল খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। তারাও হাত নাড়তে লাগল নিচে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে।

বনহুর তাদের উঠে আসার জন্য ইংগিত করলো।

রহমান ও রামসিং সর্দারের নির্দেশ পালন করলো। তারা উঠে এলো উপরে। রহস্যময়ী আর বানরীকে বন্ধন অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলো তারা।

বনহুর সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল ঘটনাটা তাদের কাছে। বললো বনহুর—রহমান, ঐ রহস্যময়ীকে বন্দী করতে চাই, তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

বললো রহমান—নিশ্চয়ই করব সর্দার, আদেশ করুন কি করতে হবে?

আমি লতার শিকল সহ ঐ রহস্যময়ীর দিকে এগিয়ে যাব আর তোমরা বানরীকে ধরে রাখবে মজবুত করে, যেন সে আক্রমণ চালাতে না পারে।

রহমান এবং রামসিংয়ের সহায়তায় বানরী-কন্যাকে পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগল না।

বানরী-মাতার চিৎকার আর ঝটপটানিতে পর্বতের পাদমূল কেঁপে উঠলো যেন।

আশা কিন্তু খুব খুশি হয়েছে। রহস্যময়ীকে এবার তারা নিজেদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে। বেচারী রহস্যময়ী তখন বন্ধন অবস্থায় দাঁত দিয়ে নিজের দেহের লতার শিকল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছিল।

বানরীর চিৎকারে সবার কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হয়েছে। বানরী বন্ধন অবস্থায় লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে ভীষণভাবে। মানবী-কন্যাকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল সে।

তেমনি মানবী-কন্যাও তার বানরী-মাতার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু কিছুতেই দেহের বন্ধন শিথিল করতে পারছে না।

রহমান বললো—সর্দার, আর বিলম্ব করা উচিত হবে না, একে নিয়ে চলুন আমরা ফিরে যাই।

রামসিং বললো—হঠাৎ কোন আক্রমণ আসতে পারে সর্দার।

হাঁ, তোমরা যা বলছ সত্য। এই নির্জন পর্বতমালার পাদমূলে আর আমরা থাকতে চাই না। আশাকে উদ্ধার করতে এসে একটি অদ্ভুত নারীকে আমি উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম, এজন্য অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

❑

রহস্যময়ীকে নিয়ে ফিরে এলো বনহুর ও তার অনুচরদ্বয় হিন্দল ঘাটিতে। আশাও এসেছে তাদের সঙ্গে, যদিও সে ইচ্ছা করলে নিজ আস্তানায় ফিরে যেতে পারত, কারণ সে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। চীনা দস্যু নাংচু হুয়াংয়ের বন্দীশালা থেকে বনহুর তাকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর অবশ্য বলেছিল—চলো আশা, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অভিমানভরা কণ্ঠে বলেছিল আশা—আমি বুঝি তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসেছি?

হেসে বলেছিল বনহুর—না, তার জন্য বলছি না, বলছি অনেকদিন তুমি আস্তানা ছাড়া কিনা?

আশার মন এ কথায় খুশি হয়নি, কারণ তার মন চায় সব সময় বনহুরের পাশে থাকতে। যদিও সে জানে ওকে সে কোনদিন একান্ত আপন করে পাবে না বা পেতে পারে না, তবু যেন সে পারে না নিজকে সরিয়ে নিতে। অবশ্য আশা নিজেও জানে বনহুরের আস্তানায় তাকে বেমানান লাগছে। বনহুরের অনুচরগণ তাদের সর্দারের পাশে সর্বক্ষণ কোন নারীকে দেখছে, এটা তারা কামনা করে না। আশা বুঝতে পারে অনুচরদের মনের কথা, তবু পারে না আশা সরে যেতে।

রহস্যময়ীকে হিন্দল ঘাটির একটা কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে তাকে শুধু ফলমূল খেতে দেয়া হয়। এখনও কেউ তার সম্মুখে যাবার সাহস পায় না, কারণ রহস্যময়ী দাঁত ও নখ দিয়ে কামড়ে ছিড়ে ফেলবে যে তার পাশে যাবে।

এমন অদ্ভুত একটি মানবীকে হিন্দল আস্তানায় নিয়ে আসার পর বনহুরের মনে শান্তি ছিল না, সব সময় তার মনে উদ্বিগ্নতা, যদি কোনক্রমে ছাড়া পায় তাহলে রহস্যময়ী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে এবং তার আক্রমণে আস্তানার অনুচরদের ক্ষতি সাধন হতে পারে।

বনহুর সেদিন বিশ্রামাগারের শয্যায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট পান করছিল। ললাটে ফুটে উঠেছে চিন্তারেখা, কারণ কান্দাই আস্তানায় যাওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন। একবার তাকে যেতে হবে হাজরা গ্রামে, সেখানে কিছু কাজ এখনও বাকি আছে। এ ছাড়াও অন্যান্য চিন্তা তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল। একরাশ ধুম্র কুন্ডলির ফাঁকে বনহুর তাকিয়ে ছিল সম্মুখে। হঠাৎ নূরের স্মৃতি ভেসে উঠলো তার মানসপটে—সেই বিদায় দিনের কথা মনে পড়তেই চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। নূর বিলেত গেছে—সেখানে সে লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, তারপর ফিরে আসবে দেশে। কত আনন্দ.........খুশিতে ভরে উঠে বনহুরের হৃদয়।

ঐ সময় আশা প্রবেশ করে সেই কক্ষে। বনহুরকে আপন মনে ভাবতে দেখে পাশে এসে দাঁড়ায়, শান্তকণ্ঠে বলে—কি ভাবছো বনহুর?

বনহুর অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, এবার শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলে—অনেক দিন আস্তানা ছাড়া কিনা, তাই......

নানা চিন্তা মনে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, না?

হাঁ আশা, সত্যি।

কই, বসতে বললে না তো?

ভুল হয়েছে আশা, ক্ষমা কর! বসো এবার—কেমন?

আশা বসে ছিল বনহুরের শয্যার পাশে একটা চেয়ারে। বনহুর আর আশার মধ্যে চললো রহস্যময়ীকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা।

বললো আশা—ওকে ফলের মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুমিয়ে দিয়েছিলাম.........

বনহুর সোজা হয়ে বসলো—তারপর?

তারপর ওকে কাপড় পরিয়ে দিয়েছি।

সত্যি?

হাঁ, কিন্তু জেগে উঠে সে কাপড় টেনে-হিঁচড়ে ছিড়ে ফেলেছে।

তা ফেলবেই, কারণ সে কাপড় পরায় অভ্যস্থ নয়।

কাপড় ছিঁড়ে ফেললেও সে মাজা থেকে সম্পূর্ণ কাপড় খুলে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতীর মতই কাজ করেছ। আশা, আমার ভরসা আছে তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। পুনরায় বনহুর শয্যায় দেহ এলিয়ে দেয়। একটু থেমে বলে বনহুর—আশা, এমনি আর একটি নারী আমার জীবনে

এসেছিল! তার নাম ছিল জংলীরাণী। অদ্ভুত সে নারী.........বনহুরের গলাটা কেমন যেন বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

আশা লক্ষ্য করলো বনহুরের বিচলিত মনোভাব। তার মনে প্রশ্ন জাগলো—কে সে জংলীরাণী, যার কথা স্মরণ করে বনহুরের মত কঠিন প্রাণে ব্যথা জেগেছে। বললো আশা—কে সে নারী, বলবে কি?

বনহুর পুনরায় একটি সিগারেটে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করে বললো—ঠিক এই রহস্যময়ীর মতই সেও ছিল একজন মানবী কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ জংলী।

তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে বলবে সেই জংলীরাণীর কাহিনী?

বলবো। বনহুর সিগারেট থেকে ধূম্ররাশি ত্যাগ করে বলে আবার—জংলীরাণীকে আমি প্রথম যেদিন দেখি সেদিন বিস্মিত হই, বিশ্বাস করতে পারিনি সে মানবী, কারণ এত রূপ ছিল তার দেহে, সত্যি অপূর্ব বলা চলে!

বনহুর বলে যায় সেই জংলীরাণীর কাহিনী।

আর আশা শোনে মনোযোগ দিয়ে। আশা স্থিরভাবে লক্ষ্য করছিল বনহুরকে। জংলীরাণীর কথা বলতে গিয়ে বারবার বনহুরের গলাটা ধরে আছিল, একটা গভীর ব্যথার ছোঁয়চ যেন ওর মনে আঘাত করে চলেছে, তবু বলে চলে বনহুর—জংলীরাণীও একদিন কাপড় পরতে শিখলো, এমন কি কথা বলতেও পারল সে। জান আশা, শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো জংলীরাণী একদিন আমাকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়তো। থামলো বনহুর।

আশা গভীর মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনলেও একটা ঈর্ষার আভাস জাগছিল তার মনে। কারণ আশাও যে ওকে ভালবাসে অন্তর দিয়ে। একজনের ভালবাসার বস্তুকে অপরজন ভালবাসতো বা বাসে জানতে পারলে ঈর্ষা হবার কথাই বটে। বিশেষ করে নারী হৃদয় যেমন কোমল মায়াময়, তেমনি ঈর্ষাপরায়ণ—আশার মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ছিল না কিছু।

বনহুর বলে চলেছে—রোজ একবার করে যেতাম সেই জঙ্গলে। বিশ্বাস কর আশা, কেন যেন ওকে ভাল লাগল আমার। একটা অমানুষ মেয়ে জংলীরাণী আকৃষ্ট করলো আমাকে.......

আশার মুখমণ্ডল গম্ভীর লাগছে, যদিও সে নিজকে সংযত রেখেছে অতি সাবধানে, তবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে।

বনহুরের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, সে আপন মনে বলে যাচ্ছে—একদিন আমি যেতে পারিনি, সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ আমার কানে এলো জংলীরাণীর কণ্ঠস্বর। যেন স্বপ্নের মধ্যে আমি জংলীরাণীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, কান পাতলাম কিন্তু আর শুনতে পেলাম না। মনে করলাম হয়তো ওটা আমার মনের খেয়াল।

তারপর? বললো আশা।

বনহুর বললো—তারপর আর কোনদিন জংলীরাণীর কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাইনি, আর কোনদিন তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি আমার ভাগ্যে! বনহুর নিশ্চুপ সিগারেট পান করে চললো।

আশা বুঝতে পারল ওর ভিতরটা ব্যথায় মোচড় খেয়ে উঠছে। একটা বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বনহুরের বুক চিরে।

আশা কোন কথা বলতে পারল না, কারণ বনহুরের হৃদয়ের ব্যথাটা যেন তার মনেও ছায়াপাত করেছে। কক্ষ নীরব, শুধু বনহুরের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে বনহুর সিগারেট থেকে ধোঁয়া নির্গত করে চলেছে।

আশা এক সময় উঠে দাঁড়ালো সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে বলে।

বনহুর বললো—বসো।

আশা বাধ্য ছাত্রীর মত পুনরায় আসন গ্রহণ করলো।

বনহুর বললো—শেষ না শুনেই চলে যাচ্ছিলে যে আশা?

আশা কোন কথা বললো না।

বনহুর বললো—জংলীরাণী……রাণীকে আর কোনদিন দেখতেও পাব না, কারণ কি জান?

বললো আশা—আমি কেমন করে জানবো বলো?

তা বটে তুমি কেমন করে জানবে। একদিন আমিও জানতাম না। শেষ কাহিনী বড় করুণ! পরে জানতে পেরেছি জংলীরাণীকে চোরাবালি গ্রাস করেছিল……আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না।

আশা কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলো, বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং পায়চারী করতে লাগল সে পিছনে হাত দু'খানা রেখে। মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন হয়ে উঠেছে।

আশা তাকিয়ে দেখলো, বনহুর মাঝে মাঝে অধর দংশন করছে, নিজের মনের যন্ত্রণাকে সে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে।

আশা এবার বললো—জংলীরাণীকে তুমি খুব ভালবেসেছিলে, তাই না?

খুব নয়, তবে ভাল লেগেছিল ওর সরল-সহজ আচরণ। ভাল লেগেছিল ওর স্বচ্ছ-সাবলীল হাসি। ভাল লেগেছিল ওর নির্মল পবিত্র ভালবাসা। বিশ্বাস কর আশা, জংলীরাণীর মধ্যে ছিল না কোন কামনা-বাসনা কিংবা মোহ। সে নিজেই ছিল এক মোহময়ী নারী। বনহুর পুনরায় আসন গ্রহণ করলো, তারপর বললো—আশা, একটি সুন্দর হরিণীকে যেমন মানুষ ভালবাসে, আমিও ঠিক তেমনি ভালবেসেছিলাম ওকে। যাক ওসব পুরোন কথা—এখন রহস্যময়ী এসেছে ঠিক জংলীরাণীর মতই অবুঝ একটি জন্তুর মত আমাদের পাশে। আমি চাই ওকে তুমি মানুষ রূপে তৈরি করবে।

একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—অনেক কাজ পড়ে আছে আমার, তাই এবার যেতে হবে। আশা, তুমি আমার হিন্দল আস্তানায় থাকবে যতদিন রহস্যময়ীকে তুমি তোমার মত তৈরি করতে না পারবে।

কিন্তু.........

জানি তোমার আস্তানায় তোমার প্রতীক্ষায় সবাই পথ চেয়ে আছে, তবু এ দায়িত্ব তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে আশা।

আমি কি একা পারবো?

পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

তবু.........

না, কোন অসুবিধা হবে না, হিন্দল ঘাটির আমার অনুচরগণ তোমাকে সহায়তা করবে।

তুমি আবার করে ফিরে আসবে?

ঠিক বলতে পারবো না, তবে নিশ্চয়ই আসব।

আশার চোখ দুটো ছল ছল হয়ে উঠলো।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—আশা, জানি তুমিও নারী, তবে সাধারণ দশ জনের মত নও, তাই তোমার উপর আমি ভরসা করতে পারি!

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায়—সর্দার!

রহমান কক্ষে প্রবেশ করতেই আশা বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বললো বনহুর—শোন আশা, একটু দাঁড়াও। তারপর রহমানের দিকে তাকিয়ে বলে—রহমান, রামসিংকে ডেকে আন।

রহমান বেরিয়ে যায়।

আশা প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি তুলে ধরে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—এখন থেকে তুমি আমার হিন্দল আস্তানার একজন হলে আশা।

আশা কোন জবাব দিল না, তবে সে বেশ বুঝতে পারল বনহুর যা বলছে তা সত্য এবং রামসিংকে ডেকে সে কথাই বলে দেবে সে।

ততক্ষণে রামসিং আর রহমান এসে দাঁড়ালো সেই কক্ষে।

কুর্ণিশ জানালো রামসিং।

বনহুর বললো—আমি কান্দাই অভিমুখে আজই রওনা দেব। রহমান আমার সঙ্গে যাবে। রামসিং, তুমি সব সময় আশার কাছাকাছি থাকবে। রহস্যময়ী নারীর ব্যাপারে তুমি ওকে সর্বক্ষণ সহায়তা করবে, যেন কোন অসুবিধা না হয়।

আচ্ছা সর্দার! বললো রামসিং।

আশা তখন বেরিয়ে গেল।

বনহুর বললো—রহমান, আজই আমি রওনা দেব, তুমি তৈরি হয়ে নাও। রামসিং থাকবে এখানে, যতদিন আশা রহস্যময়ীকে সভ্য মানবী হিসেবে তৈরি করতে না পারে ততদিন আশাকে সহায়তা করবে সে।

আচ্ছা সর্দার, আপনার নির্দেশমত কাজ করব। কথাগুলো বললো রহমান।

রামসিং বললো—সর্দার, জম্বু কবে ফিরে যাব?

বলেছিলো রহস্যময়ী যতদিন সভ্য মানবীতে পরিণত না হয় ততদিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

রামসিং কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—চলো দেখে আসি রহস্যময়ী কি করছে।

চলুন সর্দার।

❑

বনহুর তার দরবারকক্ষে এসে সুউচ্চ আসনের পাশে দাঁড়িয়েছে। তার অনুচরবৃন্দ দন্ডায়মান। সবার মুখেই একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে!

বনহুরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রহমান।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—নিয়ে এসো স্বনামধন্য মহান ব্যক্তিদের।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান বেরিয়ে গেল দরবারকক্ষ থেকে।

সমস্ত দরবারকক্ষ গম্ গম্ করছে।

একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে সবাই। বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন-ভীষণ দেখা যাচ্ছে দরবারকক্ষে একটি সূঁচ পতনের শব্দও শোনা যাবে এ মুহূর্তে।

দরবারকক্ষের দেয়ালের চার কোণায় চারটি মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

মশালের লালচে আলোতে ভীষণ লাগছে সবাইকে, কারণ বনহুরের অনুচরদের সবার শরীরে ছিল জমকালো পোশাক। হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার বর্শা। মাথায় কালো পাগড়ি, গায়ে কালো পাট্টা।

বনহুরের দেহেও জমকালো পোশাক। মাথার পাগড়ি দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে, যেন অগ্নিগোলকের মত জ্বলছে।

বনহুরের হাতে কিছু নেই কিন্তু তার সম্মুখের টেবিলে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা গাঁথা আছে। ছোরার কিছু অংশ টেবিলে গাঁথা থাকলেও বাকি অংশে মশালের আলোকশিখা এসে পড়ায় বিদ্যুতের মত ঝল্‌কাচ্ছে। বনহুরের কোমরের বেল্টে জমকালো রিভলবার চক্‌চক্ করছে।

বনহুরের এ দরবারকক্ষ কোথায় কেউ জানে না। তবে অনেকেই জানে বনহুরের আস্তানা কান্দাই জঙ্গলে। অবশ্য এ ধারণা মিথ্যা নয়, বনহুরের আস্তানা কান্দাই জঙ্গলের গভীর তলদেশে।

এ আস্তানার ঠিকানা কেউ জানে না। বহুকাল পূর্বে দস্যু কালু খাঁ এই আস্তানা তৈরি করেছিল। দস্যু কালু খাঁর মৃত্যুর পর সর্দার হলো বনহুর।

সমস্ত দেশবাসী জানে, বনহুর কান্দাই জঙ্গলে বাস করে। পুলিশ মহল তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও আজও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি এই ভূগর্ভ আস্তানাটি। তবে পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরী একবার কান্দাই জঙ্গলে অনুসন্ধান চালিয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধান পেয়েছিল কিন্তু আসল আস্তানা খুঁজে পায়নি। মিঃ জাফরীর দলবলের সঙ্গে মোকাবেলা হয়েছিল দস্যু বনহুর ও তার অনুচরবৃন্দের—হতাহতও হয়েছিল উভয় পক্ষের কিছু কিছু, তবু দস্যু বনহুরকে তারা খুঁজে পায়নি এবং খুঁজে পায়নি তার ভূগর্ভ আস্তানা।

বনহুরের সেই ভূগর্ভ আস্তানার দরবারকক্ষে আজ বিচার হবে জম্বু অধিনায়কদের। যারা জম্বুর দুঃস্থ অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল, যাদের ইংগিতে জম্বুর জনগণের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এসেছিল অনাহার আর অপমৃত্যু, আজ সেই অধিনায়কগণকে হাজির করা হবে। বনহুরের অনুচরদের মনেও আজ আগুন জ্বলছে, চোখেমুখে তাদের কঠিন আভাস। হিংস্র ব্যাঘ্রের মত মনে হচ্ছে এক একজনকে। বনহুরের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে যেন।

রহমান প্রবেশ করলো দরবারকক্ষে। তার পিছনে দু'জন অনুচর শিকলপরা অবস্থায় নিয়ে এলো জম্বু অধিপতিদের।

যেন জীবন্ত এক একটি কঙ্কাল।

ওদের এনে দাঁড় করানো হলো বনহুরের সম্মুখে। ক'মাস পূর্বে যাদের দেহ ছিল নাদুস-নুদুস, আজ তাদের দেহ চামড়া-ঢাকা কংকালে পরিণত হয়েছে। চোখ দুটো বসে গেছে চার আংগুল। চোয়াল বেরিয়ে পড়েছে, মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ। করুণ অসহায় চোখে তাকালো তারা বনহুরের দিকে।

মহান অধিপতিদের মধ্যে একজন হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো—বাঁচান, আমাদের বাঁচান আপনি.........

বনহুর নিশ্চুপ ছিল এতক্ষণ, এবার সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সে হাসির শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠলো দরবার কক্ষের পাষাণ প্রাচীর।

বনহুরের অনুচরগণের ধমনির রক্ত সে হাসির শব্দে টগ্ বগ্ করে উঠলো, তারা সজাগ হয়ে উঠলো সবাই। মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো তাদের।

শিউরে উঠলো জম্বু অধিপতিগণ, তারা করুণ চোখে অসহায়ভাবে তাকালো বনহুরের অর্ধ আচ্ছাদিত মুখমণ্ডলের দিকে। দীর্ঘকাল পূর্বে তারা ঐ মুখ দেখেছিল জম্বু নদীর ধারে। সেদিনও ঐ মুখ তেমনি ঢাকা ছিল পাগড়ির আঁচলে, শুধু ঐ চোখ দুটি তারা দেখেছিল। তাদেরই মালামাল তাদের স্বহস্তে জম্বুর দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল এই সেই জমকালো মূর্তি। তারপর বহুদিন তারা ওকে দেখেনি, দেখেনি ঐ চোখ দুটো যে চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হয়।

বন্দীরা সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। কারও মুখে কোন কথা নেই, সকলের মুখই শুষ্ক কাঠের মত শক্ত আর ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

বনহুর হাসি বন্ধ করে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—বাঁচাবো? বাঁচাবো তোমাদের? না তোমরাই বাঁচাবে আমাদেরকে?

মাফ করুন! মাফ করুন আমাদের সকলকে। দু' হাতে বনহুরের পা চেপে ধরতে গেল এক মহান ব্যক্তি।

বনহুর পা সরিয়ে নিলো, তারপর বললো—হে স্বনামধন্য মহান অধিপতিগণ, তোমরা আজ এক নরাধমের পদপ্রান্তে ক্ষমা প্রার্থী........হাঃ হাঃ হাঃ আল্লাহর কি মহিমা! একদিন তোমাদের পদমূলে লুটোপুটি খেয়েছে দেশের দুঃস্থ জনগণ। সেদিন তাদের কথা তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, সেদিন তাদের চোখের পানিতে তোমাদের হৃদয় সিক্ত হয়নি। সেদিন তোমরা ছিলে নেশাগ্রস্ত.........ঐশ্বর্যের নেশা, অর্থের নেশা, নারীর নেশা—আজ সে নেশা কেটে গেছে, না? দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর।

মহান অধিপতিগণ বারবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো বনহুরের মুখের দিকে। তার কথাগুলো যেন ওদের হৃৎপিন্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলো, ভয়ে পিলে কুঁকড়ে গিয়েছিল—জানে তারা, আজ আর নিস্তার নেই—মৃত্যু তাদের অনিবার্য।

বনহুর ছোরাখানা তুলে নিল একটানে টেবিল থেকে, তারপর পুনরায় টেবিলে গেঁথে দিয়ে বলে উঠলো—আজ বেশি কথা বলতে চাই না। বলো কি চাও তোমরা—মুক্তি না মৃত্যু?

বন্দীরা সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো, তারপর একজন বলে উঠলো—আমরা যা করেছি তা ভুল করেছি, আর আমরা অন্যায় কাজ করব না।

সত্যি বলছ?

হাঁ, সত্যি বলছি, এবারের মত আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা অনুতপ্ত, দুঃখিত........

বলো জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলবে না তোমরা।

আমরা আর কখনও তা করব না—আমরা শপথ করছি। যে শাস্তি আমরা পেয়েছি তা চরম শাস্তি।

হাঁ, এবার তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ অসহায় গরিব জনগণের ক্ষুধার জ্বালা কেমন?

বুঝতে পেরেছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। আর কষ্ট দিবেন না, ক্ষমা করে মুক্তি দিন, আর কোন দিন অন্যায় কাজ করব না।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান?

বলুন সর্দার?

আমি এদের মুক্তি দেব না মৃত্যুদন্ড দেব তোমাদের কাছে জানতে চাই।

রহমান কিছু বলার পূর্বেই বনহুরের অনুচরদের একজন বলে উঠলো—সর্দার, আমরা আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি, বলুন এই মুহূর্তে জম্বুর মহান অধিপতিদের মুখগহ্বরে বর্শা প্রবেশ করিয়ে দিই!

অন্যান্য অনুচর সবাই একসঙ্গে বলে উঠে—সর্দার, এই নরপশুদের মৃত্যুদন্ড চাই। এরা অসহায় জনগণের আহার নিজেরা আত্মসাৎ করেছে, কাজেই এখন তাদের মুক্তি নেই। আদেশ করুন সর্দার।

বনহুরের অনুচরগণ সবাই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বনহুরের কণ্ঠের একটিমাত্র শব্দের প্রতীক্ষা করছে সকলে, সঙ্গে সঙ্গে এক একজনকে বর্শাবিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সবাই।

বলির পাঠার মত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে মহান অধিপতিগণ, আজ তাদেরকে ভিজা বিড়ালের মত মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো—এই মহান অধিপতিদের পাপ এত বেশি যার জন্য এত শীঘ্র মৃতুদন্ড দিয়ে এদের মুক্তি দেয়া যায় না। কাজেই আমি চাই এরা আরও কিছুদিন পৃথিবীর বুকে জীবিত অবস্থায় থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।

একজন বলে উঠলো—না না, আর আমরা জীবিত থাকতে চাই না, আমাদের সবাইকে হত্যা কর, হত্যা কর.........মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে উঠলো মহান অধিপতিটি।

বনহুর বললো—হত্যা আমি এত তাড়াতাড়ি করব না, আরও একবার সুযোগ দেব জনগণের সেবা করার। রহমান!

বলুন সর্দার?

এদের জীবিত অবস্থায় মুক্তি দিলাম!

সর্দার!

হাঁ, রহমান।

কিন্তু.........

নিয়ে যাও, জম্বুর নিজ নিজ আবাসে পেঁছে দিয়ে এসো।

তারপর?

তারপর জম্বু আস্তানায় জানিয়ে দেবে আমার অনুচরগণ যেন সর্বক্ষণ সন্ধান নিয়ে আমাকে জানায় এরা কিভাবে জনসেবা করছে। কথাগুলো বলে বনহুর তাকালো সম্মুখস্থ মহান ব্যক্তিদের দিকে—যাও জনদরদী বন্ধুগণ, এবার শুধু বক্তৃতায় জনগণকে মুগ্ধ না করে কাজের মাধ্যমে মুগ্ধ কর। দেশের সম্পদ গোপনে দেশের বাইরে পাচার করে দেশকে যেন আর মরুভূমিতে পরিণত করতে যেও না, তাহলে......কথা শেষ করে বনহুর ছোরাখানা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পুনরায় টেবিলে গেঁথে ফেললো, তারপর সে বেরিয়ে গেল দরবারকক্ষ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান অনুচরদের ইংগিত করলো মহান অধিপতিদের চোখে কাপড় বেঁধে ফেলতে, কারণ তাদের দরবারকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।

অনুচরগণ রহমানের নির্দেশমত কাজ করলো। তারা কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললো জম্বুর মহান অধিপতিদের চক্ষুদ্বয়। তারপর আস্তানার বাইরে নিয়ে এলো সবাইকে।

❑

বনহুর নিজ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী এসে সম্মুখে দাঁড়ালো—আজ তোমাকে কোথাও যেতে দেব না হুর, তুমি আমার বন্দী।

বনহুর জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললো—জানি তুমি আজ আমাকে ছুটি দেবে না।

সত্যি! বললো নূরী।

জামাটা খাটের একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো বনহুর আদেশ কর কি করতে হবে?

যদি বলি মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তোমার সারাটা রাত।

বেশ, রাজি আছি।

কষ্ট হবে না তোমার?

না, মোটেই না।

তবে থাক।

কিন্তু আমার একটা নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে!

নিশ্চয়ই মানব, বলো?

আমি যতক্ষণ মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবো তুমি ততক্ষণ দু'চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে।

বেশ, আমি দু'চোখ বন্ধ করে রইলাম, খবরদার তুমি বসবে না।

আচ্ছা।

নূরী দু'চোখ বন্ধ করে বসলো।

বনহুর বললো—সত্যি তুমি দেখছোনা তো?

না, আমি মোটেই দেখছি না।

বেশ! বনহুর পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো নূরীর পাশে।

নূরী একটুও টের পেল না।

বনহুর ওর পাশে বসে ওকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

নূরী বললো—ভারী দুষ্ট তুমি!

বনহুর হেসে বললো—তোমার চেয়ে নয়।

কেমন করে আমি দুষ্ট হলাম?

কতদিন পর স্বামীকে পাশে পেয়ে যে মেয়ে মেঝের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে, সে আর কিছু না হলেও দুষ্ট তো বটেই।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—তবু তোমার মত নয়।

আচ্ছা হুর?

বলো?

সেই শয়তান নরপশু জম্বু অধিপতিদের সবাইকে তুমি নাকি মুক্তি দিয়েছ?

হাঁ।

কিন্তু.........

বলো?

তাহলে এতদিন তাদের সবাইকে আটক করে রেখেছিলে কেন? কি প্রয়োজন ছিল তাদেরকে কান্দাই নিয়ে আসার?

তুমি কি চেয়েছিলে আমি তাদের মৃত্যুদন্ড দেই?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো নূরী—হাঁ, অমন নরশয়তানদের হত্যা করাই শ্রেয় ছিল।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—হত্যা করা সহজ কিন্তু জীবন দান করা সহজ নয়। নূরী, এতদিন তারা জীবন্ত অবস্থায় যে যন্ত্রণা ভোগ করেছে তা

পরকালের কবরের আজাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এত আজাবের পর হয়তো ভাল মানুষ হতে পারে ওরা.........

কিন্তু তা কি হবে?

হতেও পারে।

তাই মুক্তি দিলে?

হাঁ দিলাম, নিজেদের ভুল সংশোধনের সুযোগ দিলাম! এরপর যদি ওরা শুধরে না যায় তাহলে ওদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করব।

অভ্যাস ত্যাগ করা বড় কঠিন তাকি তুমি জান না হুর?

জানি।

তবু?

হাঁ, তবু যদি তারা সৎ-মহৎ হতে পারে।

শুনলাম, দেশ থেকে মূল্যবান খাদ্যসম্পদ সরকারের গুদামে নেবার নাম করে চো'বাচালান হচ্ছে?

সে কথা মিথ্যা নয়, তবে সবটাই সত্য নয়। কিছুসংখ্যক লোক সরকারি অফিসার কিংবা সরকারের নাম ধরে গ্রাম-বন্দর বা শহরের হাটবাজার থেকে স্বল্পমূল্যে খাদ্যসম্পদ ক্রয় করে গোপনে বিদেশে পাচার করছে কিংবা আপাততঃ গুদামজাত করে মুনাফা বাড়ানোর আয়োজন করছে।

এসব নরশয়তানকে শায়েস্তা করা একান্ত দরকার। শুনেছি সরকার কঠোর হস্তে এসব দুষ্কৃতিকারীকে দমনের ব্যবস্থা করেছে?

হাঁ, কিন্তু তাতে সফলতা আসেনি বরং অনেক সময় দুষ্কৃতি ভ্রমে সৎ-মহৎ ব্যক্তিরা চরম লাঞ্ছনা ভোগ করছে। বনহুর কথাটা বলে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বললো—শুধু তাই নয়, আরও অনেক অন্যায়-অনাচার হচ্ছে যা জনগণের রক্তে শোষণ করার নতুন এক পদ্ধতি। সরকার অবশ্যি জনগণের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্য নিয়েই কতগুলো আইন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে কিন্তু সেই ব্যবস্থাকে বিকৃত করে দিচ্ছে কতগুলো স্বার্থপরায়ণ নরপশু। যাক, ওসব নিয়ে আলোচনার সময় এটা নয়।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে চলেছে।

বনহুর আপন মনে সিগারেট থেকে ধোঁয়া নির্গত করছিল, দৃষ্টি তার বিশ্রাম কক্ষের করিডোরে। কি যে চিন্তা করছিল সেই জানে।

বললো নূরী—এতদিন কোথায় ছিলে?
হিন্দল ঘাটিতে।
মিথ্যে কথা, তুমি না আশার উদ্ধারে গিয়েছিলে?
হাঁ, গিয়েছিলাম।
কই, বললে নাতো আশাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছ কিনা?
হয়েছি। তার সঙ্গে একটি নতুন জীব উদ্ধার করেছি নূরী।
সে কেমন?
মানবী রাক্ষসী!
মানবী রাক্ষসী—বলো কি!
হাঁ, সে এক অদ্ভুত নারী।
নারী?
হাঁ।
বলবে না মানবী কি করে রাক্ষসী হলো?
সে কথা আমিও জানি না, তবে যতটুকু জানি বলছি······বনহুর নূরীর কাছে অদ্ভুত নারী সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে।
সব শুনে নূরীর দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়, সে ব্যাকুল হয়ে উঠে তাকে একবার স্বচক্ষে দেখার জন্য।
বনহুর বলে—বেশ তাই হবে, রহস্যময়ীর কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। তবে এখন নয়, যখন তোমার মত মানবীতে রূপ নেবে। বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।
নূরীর হৃদয়ে বয়ে যায় একটা আনন্দোৎসব। কতদিন পর সে বনহুরকে এমনভাবে কাছে পেয়েছে। ও যে তার জীবনের পরম কামনার বস্তু। নূরী চায় এমনি করে সর্বক্ষণ ওকে কাছে পেতে কিন্তু সে জানে, কোনদিন সে সাধ পূর্ণ হবার নয়। ওকে যতই ধরে রাখতে চেষ্টা করুক না কেন, ধরে রাখতে পারবে না সে। একটা অভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নূরীর মনে। বনহুর তার একার নয়, কথাটা মনে জাগতেই একটা ব্যথা খচ্ খচ্ করে তার হৃদয়ে, একটা ঈর্ষা জাগে তার মনের কোণে। বনহুরের বাহু বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে বলে—হুর, তুমি চলে যাও, তোমার প্রেম-ভালবাসা আমি চাই না।
বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে বনহুর—সেকি!
না, এমনি করে তুমি আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়ো না।

নূরীর মুখে এমন কথা সে কোনদিন শোনেনি, বনহুর জানে অভিমান করতে সে জানে না; নূরী অদ্ভুত নারী, কিন্তু আজ তার মুখে এমন কথা সত্যি আশ্চর্য লাগে বনহুরের কাছে।

নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে বনহুর—হঠাৎ কি হলো তোমার বলো নূরী?

নূরী ভারী গলায় শান্তকণ্ঠে বলে—কি হবে এই ক্ষণিকের আনন্দ, তোমার ভালবাসা সে তো সবার জন্য। আমি চাই না তোমাকে......

নূরী!

হুঁ।

কি বলছো নূরী?

বলছি কত নারীই না তোমার জীবনে এসেছে—নারী যেন তোমার জীবনের উৎস। যেখানেই গিয়েছো কোন না কোন নারী তোমার সঙ্গিনী হয়েছে। সবাইকে তুমি ভালবেসেছো।

বনহুর হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে, তারপর হাসি থামিয়ে নূরীকে জোরপূর্বক বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—অভিমানিনী শোন, হয়তো তোমার কথা সত্য, যেখানে গিয়েছি কোন না কোন সূত্র ধরে আমার সান্নিধ্যে এসেছে কোন না কোন নারী কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়। তবে তোমার শেষ কথাটা সত্য নয়!

তুমি কি অস্বীকার করতে চাও তাদের তুমি ভালবাসোনি?

স্বীকার করি না, কোনদিন এ কথা আমি স্বীকার করবও না, কারণ তেমন অবস্থা কোনদিন আমার জীবনে আসেনি। হয়তো আসবেও না।

সত্যি বলছো?

হাঁ নূরী, বিশ্বাস কর কেউ আমার মনে দাগ কাটতে পারেনি, তবে দু' একজনের কথা আজও স্মরণ হলে মন ব্যথায় ভরে উঠে। যারা জীবনের বিনিময়ে নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছে........একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো—তারা আমার জীবনে অমর হয়ে থাকবে।

বনহুরের কণ্ঠ কেমন ভারী মনে হলো নূরীর কাছে।

বনহুর তখন আপন মনে সিগারেট পান করে চলেছে। রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে নূরীর চারপাশে।

❑

জম্বুর সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে রহমান ও জম্বু অধিপতিগণ এসে পৌঁছলো জম্বু ঘাটিতে। এখনও তাদের দু'চোখে মজবুত করে পট্টি বাঁধা। এতটুকু ফাঁক নেই যে তারা দিনের আলো দেখবে। এখন রাত কিংবা দিন ওরা জানে না, যদিও হাত-পা বন্ধনমুক্ত ছিল, তবু ওরা হাত তুলে চোখের পট্টি দেখতে পারেনি। সেই শক্তিটুকুও তাদের নেই! কতদিন হলো এই মহান অধিপতিগণ অর্ধভূক্ত ক্ষুধার্ত।

জম্বুর ঘাটিতে নিয়ে আসার পর সবার চোখের বাঁধন মুক্ত করে দিল রহমান, তারপর একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো—শিবুনাথ, তুমি এদের সবাইকে বন্দীশালায় নিয়ে যাও।

একজন অধিপতি কেঁদে কেঁদে বলে উঠলো—তোমাদের সর্দার তো আমাদের মুক্তি দিতে বলেছে, তবে আবার বন্দীশালা কেন?

সে জবাব এখন পাবেন না আপনারা। নিয়ে যাও শিবুনাথ। কথাগুলো বলে রহমান বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

শিবুনাথ হাই তুলতে তুলতে এগিয়ে এলো, ঢেকুর তুলে বললো—আজ খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেছে, তাই সুস্থির পাচ্ছি না বাবা। দেখি এবার তোমরা চলো দেখি—চলো?

কোথায় যাবো?

কেন, একটু আগেই তো শুনলে বন্দীশালায়।

আমাদের মুক্তি দেবে না?

দেবো কিন্তু শপথ করবে তো আগে।

শপথ! শপথ আবার কি করব?

বন্দীশালায় চলো তারপর বুঝবে।

আর যে আমরা হাঁটতে পারছি না, মরে গেছি বাবা।

মরে ভূততো হওনি? ভূত হবে সেদিন যেদিন মুক্তি পাবে···শিবুনাথ কথাগুলো বললো।

অপর একজন অনুচর বললো—খুব ঠাট্টা করছিস্ শিবু, চল্ এদের নিয়ে চল্।

ধনপতি, ধনকুবের মহান অধিপতিগণ আজ ভিখারীর মত কাঙ্গাল, অসহায় দুঃস্থ মানুষের মত নির্জীব—চোখে অন্ধকার দেখছে, তবু শিবুর আদেশ পালনে বাধ্য হলো ওরা।

বন্দীশালায় এনে ছাগলের মত ঠেলে দিল শিবুনাথ অধিপতিদের। তারপর শিবুনাথ আর হিরুনাথ দু'জন মিলে একজনকে বেছে বের করে আনলো—সে হলো জম্বুর স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং কোটিপতি মিঃ কোরেশী। যদিও তাকে দেখে কেউ এখন চিনতে পারবে না যে, সে জম্বুর একজন অধিনায়ক।

শিবু আর হিরু মিঃ কোরেশীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বন্দীশালার বাইরে। আবার তারা তার চক্ষুদ্বয়কে মজবুত করে বাঁধলো, তারপর সুড়ঙ্গপথ বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে বের করে আনলো আস্তানার বাইরে।

সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে একটি পুলিশ ভ্যান! ড্রাইভার ছাড়া দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে বসেছিল ভ্যানটির মধ্যে।

শিবু আর হিরু মিঃ কোরেশীকে নিয়ে উঠে বসলো পুলিশ ভ্যানটিতে।

পুলিশ ভ্যান জম্বুর রাজপথ বেয়ে দ্রুত এগুতে লাগল। এ পথ সে পথ করে এক সময় পৌঁছে গেল ভ্যানখানা একটি বস্তির পাশে। নোংরা বস্তি, আশেপাশে আবর্জনা ভরা ডাষ্টবীন। শহরের আবর্জনাভরা গাড়িগুলো সেসব ডাষ্টবীনের পাশে আবর্জনা ফেলছে।

কতগুলো দুঃস্থ ব্যক্তি সেই আবর্জনার মধ্যে খাদ্যের সন্ধান করছে। কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির আবাসে হয়তো পার্টি বা ফাংশান ছিল, হয়তো বা খানাপিনার পর উচ্ছিষ্ট হাড়হাড্ডি ফেলে দিয়েছিল তারা ডাষ্টবীনে, সেই সব হাড়হাড্ডি হাতড়াচ্ছে ওরা যদি তাতে কিছু ক্ষুধা নিবারণ হয়।

ভ্যান এসে থেমে পড়েছিল ঠিক ঐ ডাষ্টবীনের পাশে, যে ডাষ্টবীনে ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য সন্ধান করছিল।

শিবুনাথ আর হিরুনাথ স্বনামধন্য ব্যক্তি মিঃ কোরেশীকে নামিয়ে নিলো ভ্যান থেকে, তারপর ঠেলে দিল ডাষ্টবীনের দিকে—যান, খাদ্য সংগ্রহ করুন।

কোটিপতি কোরেশী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ডাষ্টবীনের পাশে, যেখানে অনেকে হাড্ডির সন্ধান করছিল।

শিবুনাথ আর হিরুনাথ ভ্যানে চেপে বসলো, ভ্যান চলে গেল।

মিঃ কোরেশী এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিল যে, সে মুহূর্ত বিলম্ব না করে এদিক ওদিক তাকিয়ে সম্মুখে পড়ে থাকা একটি হাড্ডি তুলে নিয়ে কামড়াতে লাগল। ভুলে গেল সে একজন স্বনামধন্য মহান অধিপতি।

নগণ্য দুঃস্থ মানুষের পাশে সেও একজন বনে গেল। খুব করে উচ্ছিষ্ট হাড্ডি কামড়াচ্ছে।

হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দ।

চমকে মুখ তুললো মিঃ কোরেশী, থ' হয়ে গেল সে—দেখলো জমকালো পোশাকপরা সেই ব্যক্তি, যে তাকে মুক্তি দিয়েছিল। বললো জমকালো মূর্তি......কি হলো, খান, খান। একদিন রাজখানা খেয়ে যে উচ্ছিষ্ট আপনারা ফেলে দিতেন, আজ সেই উচ্ছিষ্ট খান! বুঝুন কত কষ্ট ব্যথা ঐ মানুষগুলোর বুকে, কত ক্ষুধা ঐ মানুষগুলোর পেটে.........নিন, চেয়ে কি দেখছেন, খান, খান.........

এ্যাঁ এ্যাঁ কি বলছো, কে কে তুমি? তুমিই কি সেই?

জমকালো মূর্তি পুনরায় হাসছে, সেকি ভীষণ ভয়ঙ্কর সে হাসি!

মিঃ কোরেশী দু'হাত প্রসারিত করে জমকালো মূর্তিটিকে ধরতে গেল কিন্তু সব ফাঁকা—কেউ নেই সেখানে, শুধু দাঁড়িয়ে আছে একজন ভিখারী পাগল। এতক্ষণ সেই পাগলটাই হাসছিল।

মিঃ কোরেশীর চোখে মনে হচ্ছিলো সে দেখতে পাচ্ছে সেই জমকালো মূর্তিটিকে যে তাকে মুক্তি দিয়েছিল।

শিবুনাথ ও হিরুনাথ সহ পুলিশ ভ্যান এসে থামলো জম্বু আস্তানার মুখে।

শিবুনাথ পুলিশবেশী তাদেরই অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো—আজ একজনকে ছেড়েছি, কাল পুনরায় আর একজনকে ছাড়বো। প্রতিদিন এক একজনকে ছাড়বো, তোমরা রোজ ভ্যান নিয়ে উপস্থিত থাকবে!

মিঃ কোরেশী পাগলের মত, ভিখারীর মত, অসহায়ের মত, ডাষ্টবিনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো। একদিন যে গাড়ি হাঁকিয়ে রাশিকৃত ধূলো ছাড়িয়ে রাজপথে চলতো, যার দেহে মূল্যবান স্যুট শোভা পেতো, যার চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা থাকত, আজ সেই কোরেশী ছিন্নভিন্ন বেশে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

পথে অনেকে তাকে দয়া করে পয়সা ভিক্ষা দিতে গেল। সে সংকোচে হাত গুটিয়ে নিল। কেউ বা চাউল ভিক্ষা দেবার জন্য ডাকলো, সে লজ্জায়

কুঁকড়ে গেল। কেউ বা উচ্ছিষ্ট খাবার দিতে গেল কোরেশীকে, তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। যার দরজায় রাইফেলধারী প্রহরী সদা দন্ডায়মান, আজ সে কিনা ভিখারীর মত পথ চলেছে।

বাড়ির দরজায় পৌঁছতেই দারোয়ান রুখে দাঁড়ালো ভাগো, ভিক্ষা হবে না।

দারোয়ানের ব্যবহারে দু'চোখ ফেটে পানি এলো মিঃ কোরেশীর, সে হাতের পিঠে চোখ মুছে বললো—আমাকে তুই চিনতে পারছিস না? আমি কে জানিস?

না, আমি তোমার পরিচয় জানতে চাই না—বেরিয়ে যাও, ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিও না।

মিঃ কোরেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সে এবার রাগতভাবে বললো—হারামজাদা, আমাকে তুই চিনতে পারছিস না? আমি তোর মালিক কোরেশী।

দারোয়ানের ধমনির রক্ত গরম হয়ে উঠলো যখন সে একজন কঙ্কালসার ভিখারীর মুখে তার মালিকের নাম শুনলো। ভাবলো এত সাহস ভিখারীর সে নিজেকে কোরেশী বলে পরিচয় দেয়! দারোয়ান এক চড় বসিয়ে দিল মিঃ কোরেশীর গালে।

দারোয়ানের হাতে চড় খেয়ে কোরেশী রাগে-ক্রোধে ফেটে পড়লো কিন্তু তার দেহ এত ক্ষীণ-দুর্বল যে, ক্রোধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার বড় ছেলে গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, সে দেখলো একটি ভিখারী সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কোরেশী সন্তানের মনে দয়া হলো, সে গাড়ি থেকে নেমে ভিখারীর পাশে এগিয়ে গেল। মিঃ কোরেশীর দেহে ছিল তার পূর্বের ছিন্নভিন্ন কোটপ্যান্ট। কোরেশীর সন্তান ভিখারী মনে করে এগিয়ে আসতেই তার মনে হলো এ ব্যক্তি যেন তার পরিচিত। মিঃ কোরেশী উধাও হবার পর থেকেই কোরেশী পরিবার কোরেশীর সন্ধানে নিয়োজিত ছিল.........হঠাৎ পুত্রের মনে জাগলো, এই ব্যক্তি তার পিতা নয় তো? কাছে এসে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই সে পিতাকে চিনে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে পিতার সংজ্ঞাহীন দেহটা বুকে জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো—আব্বা, আব্বা, তোমার একি অবস্থা হয়েছে!

দারোয়ানের তো পিলে চমকে গেল। সে একটু পূর্বে ঐ ব্যক্তিকে ভিখারী মনে করে প্রহার করেছে। ঐ ব্যক্তিই যে তার মালিক বুঝতে পারেনি। এ মুহূর্তে সে যে অপকর্ম করেছে তা মালিকেরই শিক্ষা। কোন ভিখারী এলে তাকে যেন গেটের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়া না হয় এবং দরকার হলে মেরে বের করে দেয়ার নির্দেশ আছে। দারোয়ান তার কর্তব্য পালন করেছে। এখন সেই ভিখারী যে তারই মালিক বুঝতে পেরে রাইফেল ফটকের সঙ্গে হেলান দিয়ে রেখে সরে পড়ে সে আলগোছে। কারণ মালিকের সংজ্ঞা হলে তার অবস্থা ভয়ঙ্কর দাঁড়াবে।

কোরেশী-পুত্র পিতাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেল; সে তাড়াতাড়ি দারোয়ানকে লক্ষ্য করে বললো—জাফর, শিগ্‌গির ধরো, একে চিনতে পারনি—এ যে আমার আব্বা......

কিন্তু জাফর তখন কোথায়!

শুধু রাইফেলখানা দাঁড়িয়ে আছে ফটকে হেলান দিয়ে।

কোরেশী-সন্তান পিতাকে কোলে করে গাড়ির মধ্যে শুইয়ে দেয়, তারপর নিয়ে আসে ভিতরে।

❑

মিঃ কোরেশীর সংজ্ঞা ফিরে আসার পূর্বেই শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এ সংবাদ। মিঃ কোরেশীর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই ছুটলেন গাড়ি নিয়ে কোরেশী ভবনে মিঃ কোরেশীকে দেখতে।

শহরের বড় বড় ডাক্তার এসে জড়ো হলেন, গাড়ির ভিড় জমে উঠলো কোরেশী ভবনের সম্মুখে।

মিঃ কোরেশীর পরিধান থেকে ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। তাকে দুগ্ধফেনিল শয্যায় শয়ন করানো হয়েছে। ধূপদানিতে ধূপকাঠি জ্বলছে, সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত কক্ষে।

বহু গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এলেন, সবার মুখেই একটা জিজ্ঞাসাভরা ভাব—মিঃ কোরেশী এতদিন কোথায় ছিল আর কেমন করেই বা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু কে তার জবাব দেবে—মিঃ কোরেশী তো অজ্ঞান; দারোয়ানকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলাফেরা করছেন, ইংগিতে কথাবার্তা চলেছে, কেউ উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে সাহসী হচ্ছে না। সমস্ত বাড়িটাতে কেমন একটা উদ্বিগ্নতা ছড়িয়ে আছে।

ডাক্তারগণ মিঃ কোরেশীর শয্যার চারপাশ ঘিরে বসে আছেন। কেউ বা ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করছেন, কেউ বা নাড়ী টিপে ধরে পাল্‌স্ পরীক্ষা করছেন, কেউ বা ইন্‌জেকশান্ তৈরি করে নিচ্ছেন রোগীর দেহে পুশ করবে বলে।

এক সময় সংজ্ঞা ফিরে এলো কোরেশীর। ডাক্তারগণ তখন তাকে কথাবার্তা না বলে নিশ্চুপ থাকার জন্য বললেন।

রীতিমত চিকিৎসা চললো।

এক সময় সুস্থ হয়ে উঠলো মিঃ কোরেশী। তবে এত বেশি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল যে, একেবারে সুস্থ হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল।

❑

কিছু দিন পর।

এখন মিঃ কোরেশী সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। পুনরায় ফিরে এসেছে তার নাদুস্ নুদুস্ স্বাস্থ্য। এখন তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে চলাফেরা করে।

তাঁর অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা মন্দা হয়ে এসেছিল, এখন আবার ব্যবসা রীতিমত জেঁকে উঠেছে। বড় ছেলে এখন পিতাকে যথেষ্ঠ সহায়তা করে, কারণ পিতার অভাবে সেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

পিতা গদিতে বসেছে, পুত্র তবু ব্যবসা দেখাশোনা করে যাচ্ছে। আসছে লাখ লাখ টাকা। মিঃ কোরেশী ভুলে যায় জমকালো মূর্তির কথা, ভুলে যায় তার সেই দিনের কথা। টাকার মোহ তাকে ক্রমেই আকৃষ্ট করে ফেলে।

পুনরায় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মিঃ কোরেশীর সঙ্গে যারা বন্দী ছিল বনহুরের রত্নাগারে, তারা সবাই ফিরে এসেছে এক এক করে। শিবুনাথ আর হিরুনাথ কাউকে সহজে মুক্তি দেয়নি। ইচ্ছামত তামাসা করেছে ওরা বন্দীদের নিয়ে। প্রতিটি স্বনামধন্য ব্যক্তিকে ওরা ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাইয়ে তবে ছেড়েছে। ওরা বলেছে, আপনাদের অন্যায়-অনাচার আর অবিচারে দুঃস্থ অসহায় জনগণ যেমন

ডাষ্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খেয়েছে বা খাচ্ছে—আবর্জনা হাতড়ে যেমন তারা খাদ্যের সন্ধান করছে, তেমনি আপনারাও খান, তাবেই মুক্তি পাবেন।

শিবুনাথ আর হিরুনাথের কাছে মহান অধিপতিগণের তখন পন্ডিত মশাই আর ছাত্রের সম্বন্ধ। পন্ডিত মশাই যেমন অবাধ্য ছাত্রকে চাবুক হাতে একশো বার উঠান আর বসান, তেমনি শিবুনাথ আর হিরুনাথের কথা—তারা ডাষ্টবিন হাতড়ে না খেলে মুক্তি নেই।

জম্বুর মহান ব্যক্তিরা এখন নিজ নিজ আবাসে ফিরে এসেছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন তাদের ফিরে পেয়ে মহাখুশি। আবার তারা যে যার কাজে মনোযোগী হয়েছে। তবে সবাই সতর্ক, তাদের ব্যবসার মোড় ফিরে গেছে। এখন তারা অসৎ চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে, যদিও বারবার মনে নাড়া দিচ্ছিলো সামান্য একটু এদিক-সেদিক করলেই আসছে হাজার হাজার টাকা, কিন্তু সেই জমকালো মূর্তির কথা স্মরণ হতেই কুঁকড়ে আসে তারা আপনা আপনি ঠিক কেঁচোর মত।

কিন্তু মিঃ কোরেশী ভুলে যায়, সে অর্থের মোহ ত্যাগ করতে পারেন না, পুনরায় অসৎ ব্যবসায় লিপ্ত হয়।

গদিতে বসে কাজ করে।

টেবিলে একটি নয়, দুটি টেলিফোন। অবিরত ফোন আসছে কত জাহাজ মালামাল কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে।

মিঃ কোরেশী ভুলে যায় তার জীবনের অতীত ঘটনা। সে নিছক দুঃস্বপ্ন বলে মনে করে সবকিছু।

বছর কেটে যায়।

ব্যবসায় ফেঁপে উঠে কোরেশী! প্রতিদিন তার ব্যবসার আয় দশ থেকে বিশ হাজার কিংবা তারও বেশি। সে নিজেই একজন হর্তাকর্তা। তাই তার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করতে পারে না। অবশ্য প্রকাশ্য ব্যবসা তার তেমন দৃষ্টিকটু নয় কিন্তু আসল ব্যবসা চলে তার গোপনে।

মিঃ কোরেশী সেদিন অফিসরুমে বসে কাজ করছিল। ব্যবসায় সেই মাসের হিসেবের অংক নিয়েই সে মাথা ঘামাচ্ছিলো।

হঠাৎ একটা ছোরা এসে গেঁথে গেল তাঁর টেবিলে।

চমকে মুখ তুললো মিঃ কোরেশী, দেখলো কোথাও কেউ নেই, শুধু তার সম্মুখে টেবিলে গেঁথে আছে একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা।

শিউরে উঠলো মিঃ কোরেশী। সে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো ছোরায় গাঁথা আছে একখানা চিঠি। নীল কাগজের টুকরা বলা চলে।

কক্ষে দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না, মিঃ কোরেশী কম্পিত হস্তে টেবিল থেকে ছোরাখানা তুলে নিল একটানে, তারপর ছোরা থেকে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। নীল কাগজে লাল কালিতে লেখা কয়েকটি অক্ষর।...

মিঃ কোরেশী চমৎকার
ব্যবসা চলছে, তাই না? এরই
মধ্যে ভুলে গেছেন সবকিছু?
ক্ষুধার কি জ্বালা, মুছে গেছে
আপনার মন থেকে?

—দস্যু বনহুর

মিঃ কোরেশীর হাত থেকে খসে পড়লো চিঠিখানা, সে ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো চারদিকে—না, কোথাও কেউ নেই। সে পুলিশ অফিসে ফোন করার জন্য রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালো।

যেমনি সে রিসিভারে হাত রেখেছে, অমনি একখানা বলিষ্ঠ হাত পিছন থেকে তার হাতের উপর এসেছিল।

বিস্ময়ে চোখ তুললো মিঃ কোরেশী, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—আ...প...নি...

হাঁ, কিন্তু এরই মধ্যে সব বিস্মৃত হয়েছেন?

না না, কিছু বিস্মৃত হইনি, কিছু বিস্মৃত হইনি। আমি—আমি কিছু করিনি তো......

মিঃ কোরেশী, আপনি কি করছেন না করছেন সব আমি জানি। জনসাধারণের চোখে ধূলো দিলেও আমার চোখে ধূলো আপনি দিতে পারবেন না। ক্ষমা আমি করেছিলাম, কিন্তু আপনি ক্ষমার পাত্র নন... দু'হাত বাড়িয়ে বনহুর টিপে ধরে মিঃ কোরেশীর গলা।

একটিমাত্র ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো মিঃ কোরেশীর গলা দিয়ে। বনহুর হাত দু'খানা সরিয়ে নিতেই মিঃ কোরেশীর মাথাটা কাৎ হয়ে পড়ল সামনের হাতলে।

বেরিয়ে গেল বনহুর আলগোছে।

মিঃ কোরেশীর অফিসরুমের নিচেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বনহুরের অশ্ব তাজ। বনহুর রেলিং পেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল তাজের পিঠে।

তাজ উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

ওদিকে রাত বেড়ে আসছে, মিঃ কোরেশী এতক্ষণও তার রুম থেকে বের হয়ে আসছে না দেখে কোরেশী-সন্তান পিতার অফিসরুমে প্রবেশ করে। সে দেখতে পায় মিঃ কোরেশী তার আসনে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

কোরেশী-সন্তান ডাকলো—আব্বা, ঘুমিয়ে পড়েছো? সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি দিল সে পিতার দেহে। ঝাঁকুনি দিতেই মিঃ কোরেশীর দেহটা উবু হয়ে পড়ে গেল নীচে।

কোরেশী-সন্তান বুঝতে পারল তার আব্বার মৃত্যু ঘটেছে, সে চিৎকার করে উঠলো—সর্বনাশ হয়েছে...সর্বনাশ হয়েছে...সেই মুহূর্তে দৃষ্টি তার পড়লো টেবিলে। একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এবং একটি চিঠি পড়ে আছে টেবিলের উপরে।

ততক্ষণে অফিসরুমে কয়েকজন কর্মচারী প্রবেশ করেছে। যারা কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী, মালিকের কাজে ফাঁকি দেয় না তারাই ছিল এখনও, অবশ্য মালিক অফিসে আছেন তাঁরা কি করেই বা যাবেন, তাই কাজ শেষ হবার পরও খাতাপত্র নাড়াচড়া করছিল টেবিলে বসে বসে।

হঠাৎ তাঁদের কানে গেল ছোট মালিকের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর। অন্যান্য দিন ছোট মালিক বাড়ি চলে যান, আজ তিনিও তাঁর টেবিলে বসে কাজ করছিল। রাত বেড়ে আসছে দেখে ছোট মালিক বড় মালিকের রুমে প্রবেশ করে এবং পিতাকে ঘুমন্ত মনে করে ডাকাডাকি শুরু করে, তাতেও সাড়া না পেয়ে দেহে হাত রেখে ঝাঁকুনি দেন, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে বড় মালিকের দেহটা।

কর্মচারিগণ বড় সাহেবের রুমে প্রবেশ করে প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ে, তারপর সবাই মিলে বড় সাহেবকে টেনে তুলে চেয়ারে বসানোর চেষ্টা চালায়, কিন্তু বড় সাহেবকে কিছুতেই চেয়ারে বসাতে পারে না ওরা।

ছোট সাহেব ততক্ষণে ছোরা আর চিঠিখানা তুলে নিয়েছে হাতে। চিঠিখানা পড়ে কালো হয়ে উঠলো ছোট সাহেবের মুখ।

রিসিভার তুলে নিয়ে পুলিশ অফিসে ফোন করলো ছোট সাহেব কম্পিত গলায়।

অল্পক্ষণেই পুলিশ অফিস থেকে পুলিশ প্রধানসহ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ছুটে এলেন গাড়ি নিয়ে।

মিঃ কোরেশী শুধু নামকরা ধনবান ব্যক্তিই নয়, সে সরকার মহলের লোকও বটে, তাই পুলিশ মহল ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলেন।

জম্বু পুলিশ প্রধান এসে এ রহস্যময় হত্যাকান্ড দেখে শুধু বিস্মিতই হলেন না, হতভম্ব হয়ে পড়লো। পুলিশ প্রধান ছোরা এবং চিঠিখানা দেখলেন, বুঝতে তাঁর বাকি রইলো না দস্যু বনহুর মিঃ কোরেশীকে হত্যা করেছে।

এ হত্যারহস্য নিয়ে জম্বুর শহরে ভীষণ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কথাটা জম্বুর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো।

সজাগ হয়ে উঠলো বনহুরের বন্দীশালা থেকে মুক্ত মহান অধিপতিগণ, যারা বনহুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা পেয়ে পুনরায় নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। তারা ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকর্ম করে চললো, মন থেকে মুছে ফেললো অন্যায় আর অসৎ চিন্তা।

❑

আশা বসেছিল নির্জন স্নানাগারের মধ্যে। সম্মুখে ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে। কতগুলো পাখি স্নানাগারের দেয়ালে বসে আপন মনে কিচমিচ করছিল—লাল-হলুদ-সবুজ পাখি, ভারী সুন্দর তাদের গায়ের রং, অপূর্ব তাদের কণ্ঠস্বর।

আশা ঝর্ণাধারার দিকে তাকিয়ে আপন মনে কিছু ভাবছিল, হয়তো বা রহস্যময়ী নারী সম্বন্ধেই ভাবছিল, ভাবছিল কেমন করে ওকে সভ্য করা যাবে। এ ক'দিনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, রহস্যময়ীর মধ্যে আসেনি কোন পরিবর্তন।

দুশ্চিন্তায় পড়েছে আশা। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ায় লিয়াংলিচু। পদশব্দে ফিরে তাকায় আশা—কে, লিয়াং?

হাঁ দিদি, আমি।

কি সংবাদ লিয়াং?

রহস্যময়ী আজ বড্ড ক্ষেপেছে। সে নিজের মাথার চুল টেনে ছিড়ছে। হাতের মাংস কামড়ে রক্ত বের করে ফেলছে। তুমি শিগ্‌গির চলো দিদি.......

আশা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, ছুটলো সে লিয়াংলিচুয়ের সঙ্গে।

লিয়াং আর আশা এসে দেখলো, রহস্যময়ী নিজ চুল টেনে ছিড়ছে। সম্মুখে একগাদা ফলমুল ছড়ানো। কাল যে ফল তাকে খেতে দেয়া হয়েছিল তা তেমনি পড়ে আছে, কিচ্ছু খায়নি সে।

আশা বড় দুশ্চিন্তায় পড়লো রহস্যময়ী যদি কিছু না খায় তবে তাকে বাঁচানো মুস্কিল হবে। বনহুর ওকে তারই হাতে তুলে দিয়ে গেছে—বড় ভরসা ওর, রহস্যময়ীকে আশা সভ্য করতে সক্ষম হবে।

হিন্দল ঘাটিতে আসার পর আশা লিয়াংকে সঙ্গে রেখেছে তার সাহায্যকারী হিসেবে। অবশ্য অন্যান্য অনুচর সবাই আশার কথা মেনে চলে, তবু আশা চায় না কাউকে কষ্ট দেয়। তবে যখন নিতান্ত প্রয়োজন হয় তখন ওদের সাহায্য না নিয়ে কোন উপায় থাকে না।

আশা বললো—লিয়াং, আমি ভেবেছিলাম ওকে সভ্য করতে পারবো কিন্তু দেখছি এই ক'দিনে তার মধ্যে একটুও পরিবর্তন আসেনি। আজ সে আরও ক্ষেপেছে বলে মনে হচ্ছে।

লিয়াং বললো—হাঁ দিদি, আপনি যা বলছেন সত্য, রহস্যময়ীর মধ্যে আজও কোন পরিবর্তন এলো না। এক দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো লিয়াংয়ের মুখে।

আশা আর লিয়াংকে দেখে রহস্যময়ী নারী দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে আশার দিকে স্থির নয়নে। আশা আরও কিছু সরে দাঁড়ালো রহস্যময়ীর দিকে।

এখনও রহস্যময়ীর পরনে আশার পরিয়ে দেয়া একখন্ড কাপড় রয়েছে।

রহস্যময়ীকে লক্ষ্য করে আশা বললো—হতভাগী, কিছু খাচ্ছিস্ না, মরবি যে! পরক্ষণেই কি ভেবে আশা একটা ফল তুলে নিল হাতে, তারপর খেতে শুরু করলো।

আশা বেশ দূরে দাঁড়িয়েছিল যেখানে রহস্যময়ী তার নাগাল পাবে না। একটা ফল খেয়ে আশা পুনরায় আরও একটা ফল তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

রহস্যময়ী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর সেও উবু হয়ে একটা ফল তুলে নিল হাতে এবং খেতে শুরু করলো।

আশার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে ফলগুলো বেশ চিবিয়ে খেতে লাগল। একটি দুটি করে তিন-চারটি ফল খেলো আশা। এবার আশা

খোসাযুক্ত একটা ফল হাতে তুলে নিল। ফলটা ছিল কমলালেবুর মত। আশা এবার কমলালেবুর মত ফলটার খোসা ছাড়াতে শুরু করলো। একটি দু'টি করে তিনটি ফল পর পর খোসা ছাড়িয়ে খেলো আশা।

রহস্যময়ীও আশার খোসা ছাড়ানো দেখলো, সেও ফল হাতে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল। আশার মনে নতুন আশা জাগলো, সে লিয়াংকে লক্ষ্য করে বললো—লিয়াং, আমি পারবো, ওকে সভ্য করতে পারবো, ওকে মানুষরূপে তৈরি করতে সক্ষম হব। লিয়াং, রহস্যময়ী অনেকগুলো ফল খেয়েছে। আজ আমার নিজেরও আর কিছু খাবার প্রয়োজন হবে না। চলো, এখন ও বিশ্রাম করুক।

আশা আর লিয়াং তখনকার মত চলে গেল সেখান থেকে।

পরদিন পুনরায় এসে দাঁড়ালো আশা রহস্যময়ীর দরজায়। শিকের ওপাশে রহস্যময়ী আজ চুপচাপ বসে আছে। আশাকে দেখতে পেয়ে সে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো, কতকটা বানরের কণ্ঠের মত আওয়াজ হলো।

আশা আরও লিয়াংকে সঙ্গে এনেছিল। সে লিয়াংকে বললো—লিয়াং, যাও এক পাত্র পানি নিয়ে এসো।

লিয়াং অবশ্য অবাক হলো কিছুটা তবু সে পানি আনার জন্য চলে গেল এবং একটু পরে এক পাত্রপানি সহ ফিরে এলো।

রহস্যময়ীর কক্ষে ছিল একটি পাত্র, তার মধ্যে ছিল কিছু পানি। রহস্যময়ীর যখন পিপাসা হতো তখন সে বানরের মত উবু হয়ে পানি পান করত।

আশা একটা গ্লাস হাতে নিয়ে পানির পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে পান করে ফেললো। পানি পান করে গ্লাসটা ছুড়ে দিল শিকের ওপাশে রহস্যময়ীর দিকে।

রহস্যময়ী গ্লাসটা তুলে নিল হাতে, তারপর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখলো।

আশা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে।

রহস্যময়ী গ্লাসটা নেড়েচেড়ে পানির পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে নিল কিন্তু বারবার পানি পড়ে যাচ্ছিলো, সে ঠিকমত গ্লাসে পানি উঠিয়ে নিতে পারছিল না।

হঠাৎ রহস্যময়ী ভীষণভাবে রেগে উঠলো, তারপর পানির পাত্রটি উল্টে ফেলে দিল হাত দিয়ে।

সেদিন আর বেশি বিরক্ত করলো না আশা রহস্যময়ীকে, কারণ সে রেগে গেছে ভীষণভাবে। কিন্তু নিরাশ হলো না আশা।

পরদিন আবার এলো। এভাবে প্রত্যহ আশা ওকে শিক্ষা দিতে লাগল।

চললো রহস্যময়ীর সঙ্গে আশার ইংগিতে কথাবার্তা। পানির গ্লাস ভরে মুখে দিয়ে পানি পান শেখাতে লাগল। ফল খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া শেখাতে লাগল। তারপর একদিন আশা শিকের কপাট খুলে প্রবেশ করলো ভিতরে।

রহস্যময়ী আশাকে দেখে জড়োসড়ো হলো। আশা একটা ফল নিয়ে ওর মুখে তুলে দিল, বললো—খাও।

রহস্যময়ী অবাক হলো, তবু সে হা করলো এবং ফলটা সে আশার হাতেই খেলো।

এরপর থেকে আশা রোজ রহস্যময়ীকে সভ্য নারী হিসাবে তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রথমে ফল খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া শেখালো আশা, তারপর পানি পান করা, তারপর শুকনো রুটি বা শুকনো জিনিস খাওয়া।

এখন রহস্যময়ী আশাকে দেখলে কামড়ে বা খামচে দিতে আসে না।

আশা যখন রহস্যময়ীর খাঁচায় প্রবেশ করে তখন রহস্যময়ী নিশ্চুপ থাকে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সে আশার দিকে।

আজকাল বেশি সময় আশা কাটায় রহস্যময়ীর কাছে। কেমন করে সে খাবে, কেমন করে সে শোবে, কেমন করে কাপড় পরবে, সব শেখাতে লাগল আশা ধীরে ধীরে। এমন কি একদিন আশা রহস্যময়ীর মাজার বাঁধন খুলে দিল।

রহস্যময়ী সেদিন চুপ রইলো, কোনরূপ ছুটাছুটি সে করলো না।

একদিন আশা রহস্যময়ীকে খাঁচার বাইরে নিয়ে এলো। রহস্যময়ী সহ চললো সে ঝর্ণার দিকে।

পথে পুরুষ মানুষ কাউকে দেখলে আশার গলা জড়িয়ে ধরে রহস্যময়ী, ভীষণ ভয় পায় সে পুরুষগুলোকে দেখলে। হয়তো বা প্রথম দিনের কথা মনে হয়—বনহুর, রহমান আর রামসিং তাকে ফাঁস দিয়ে পাকড়াও করেছিল। হয়তো বা সে মনে করে আবার ওরা তার গলায় ফাঁস পরাবে।

আশা ঝর্ণার ধারে নিয়ে আসে রহস্যময়ীকে।

রহস্যময়ী পানি দেখলে বড্ড ভয় পায়।

আশা একদিন ওকে ঝর্ণার পানিতে নামিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে কিছুতেই পানিতে নামেনি।

তাই আশা আজকাল প্রায়ই রহস্যময়ীকে নিয়ে ঝর্ণার পাশে আসে যদি ওকে গোসল করা শেখানো যায়। রহস্যময়ীর নখগুলো একদিন কেটে দেয় আশা।

রহস্যময়ী আজকাল আশার কাজে বাধা দেয় না। আশা একদিন চুলগুলো আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু সব জটা ধরে গেছে। আশা ছোট করে কেটে দেয়। একদিন ঝর্ণায় জোর করে গোসল করিয়ে দেয় আশা ওকে।

কেটে যায় কায়েকটা মাস।

রহস্যময়ী আজকাল একটু আধটু কথা বলতে শিখেছে, সে দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। আশা ওকে সুন্দর করে চুল আঁচড়ে দেয়, কাপড় পরিয়ে দেয়, সঙ্গে করে নিয়ে বসে কথা শেখায়।

রহস্যময়ীর চেহারা দিন দিন পাল্টে যায়, তাকে দেখলে এখন কেউ বুঝতেই পারবে না এই সেই নারী। রহস্যময়ী নারীর নাম দিল আশা শাপলা।

এখানে যখন শাপলাকে নিয়ে আশা ঝর্ণায় সাঁতার কাটে, আস্তানার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তখন বনহুর তার আস্তানায় বসে রহস্যময়ীর কথা ভাবছে। না জানি রহস্যময়ী এখন কেমন আছে, আশা তাকে কিভাবে শিক্ষা দিচ্ছে।

বনহুর আস্তানায় আসার পর জড়িয়ে পড়েছিল নানা কাজে। কখন কোথায় যায় বনহুর কেউ জানে না। তাজের বিশ্রাম নেই এক মুহূর্ত। প্রতিদিন গভীর রাতে তাজের ক্ষুরের শব্দ শহরবাসীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করত। গ্রামবাসীদের নিদ্রা ছুটে যেতো। বস্তির মানুষ উন্মুখ হৃদয় নিয়ে জেগে উঠতো আবার বুঝি এলো সে, এবার চারটি পেট পুরে খেতে পাবে।

কান্দাই শহরের বস্তি অঞ্চলে সবাই প্রতীক্ষা করে কখন আসবে সে। গভীর রাতে সমস্ত শহরবাসী যখন ঘুমে অচেতন তখন বনহুর এসে দাঁড়ায় তাদের পাশে। দুঃস্থ অসহায় মানুষগুলোর চোখের পানি মুছে দেয় সে নিজের হাতে। কার অসুখ হয়েছে, কার দেহে বস্ত্র নেই, কার মুখে আহার জুটছে না। বনহুর সবার মধ্যে এসে দাঁড়ায়, দু'হাত ভরে বিলিয়ে দেয় সকলের হাতে হাতে।

সেদিন অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গল অভিমুখে চলেছিল বনহুর। হঠাৎ পথের পাশে এক বৃদ্ধকে দন্ডায়মান দেখে অশ্বের লাগাম টেনে ধরে অশ্বের গতিরোধ করে ফেললো বনহুর, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে অশ্বের লাগাম ধরে এগিয়ে আসে সে বৃদ্ধের পাশে।

বনহুরকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ।

বনহুর কিছু বুঝতে না পেরে বললো—কি চাও বাবা বলো, যা চাবে তাই দেব।

বৃদ্ধ কান্না থামিয়ে যা বললো তা হলো এক অদ্ভুত কাহিনী......

বনহুর অশ্বের লাগাম ধরে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ বলে চললো—হাম্‌জা শহরে আমার বাড়ি ছিল। ব্যবসা, করতাম, ব্যবসা ব্যাপারে আমাকে যেতে হতো দেশ-বিদেশে। আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসতো, এক মুহূর্ত আমাকে ছাড়া থাকত না, তাই প্রায়ই সে আমার সঙ্গে যেতো ব্যবসাকেন্দ্রে। একবার আমি হিয়াংচি শহরে যাই। হিয়াংচি চীন রাজ্যে। যাবার সময় আমাকে জাহাজে যেতে হয়। সেবার আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল, স্ত্রীকে অনেক করে বললাম, এবার তুমি যেও না লক্ষ্মীটি কিন্তু সে শুনলো না, অগত্যা আমি তাকে সঙ্গে নিলাম।

বনহুর অবাক হয়ে শুনতে লাগল বৃদ্ধের কাহিনী। ঠিক আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতই মনে হচ্ছিলো তার কাছে বৃদ্ধের কথাগুলো। বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনছিল।

বৃদ্ধ বলে চলেছে—জাহাজে যাচ্ছি, হঠাৎ একদিন ঝড় উঠলো। সেকি ভীষণ ঝড়, শেষ পর্যন্ত আমাদের জাহাজখানা অতল সাগরে তলিয়ে গেল।

বনহুর বলে উঠলো—সর্বনাশ, তারপর?

বৃদ্ধ বললো—এত কথা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায়?

বনহুর বললো—বেশ, চলো বাবা ঐ গাছটার তলায় গিয়ে বসি।

বললো বৃদ্ধ—তাই চলো।

বনহুরের কাছে বেশ লাগছিল বৃদ্ধের কথাগুলো, কতকটা বিস্ময়করও মনে হচ্ছিলো। তাই সে বৃদ্ধের পিছনে পিছনে গাছটার নিচে এসে বসলো।

তাজ তখন আপন মনে ঘাস খেয়ে চলেছে।

পাশাপাশি বসলো বনহুর আর বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো—জাহাজখানা যখন ডুবে যাচ্ছিলো তখন আমি দ্রুতহস্তে একটি লাইফবয় খুলে নিলাম এবং আমার স্ত্রীকে সেই লাইফবয়ের সঙ্গে বেঁধে নিজেও কোমরে রশি বেঁধে নিলাম। জান বাবা, এখন যেমন একেবারে নেতিয়ে পড়েছি তখন তেমনটি ছিলাম না। দেহে ছিল অসীম বল, মনে ছিল সাহস, জাহাজখানা ডুবে গেলেও আমরা ডুবলাম না। আমার সুবুদ্ধির জন্য রক্ষা পেলাম আমি এবং আমার স্ত্রী জেকী।

বনহুর বলে উঠলো—আপনার স্ত্রীর নাম ছিল জেকী?

হাঁ! এক সময় ঝড় থেমে গেল, আমাদের লাইফবয় আমাকে এবং জেকীকে নিয়ে এক অজানা জায়গায় এসে পৌঁছলো—জায়গাটা বড় নির্জন। আমরা ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম জীবনে রক্ষা পেয়েছি বলে। সমুদ্রের তীরে কোথাও গাছপালা নেই, তাই মনে ভয় হলো, সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা নেই জেকীর। একে সে গর্ভবতী তদুপরি সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জেকী আর আমি তাকিয়ে দেখলাম দূরে পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে। আমরা সেই পর্বতমালা লক্ষ্য করে পা চালালাম। এক সময় পৌঁছে গেলাম পর্বতমালার পাদমূলে। একটি গুহার সন্ধান করলাম রাত্রি কাটানোর জন্য, কিন্তু কোন গুহা খুঁজে পেলাম না। সেই দিনই আমার স্ত্রী জেকীর প্রসব বেদনা শুরু হলো......থামলো বৃদ্ধ।

বনহুর আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো—তারপর?

জেকীর অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু কি করব তবু আমি যতটুকু পারি তাকে সহানুভূতি জানাচ্ছিলাম। তবে বেশিক্ষণ জেকী কষ্ট পেল না, সে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলো। আমি সন্তান দেখে মহাখুশি হলাম, যদিও আমাদের তখন বিপদকাল ছিল। কারণ, আমাদের ঐ সন্তানটি প্রথম সন্তান। জেকী সন্তান প্রসব করার পর ভয়ানক পিপাসা অনুভব করলো৷ সে খুব কাঁদাকাটা করতে লাগল, আমি তখন যেমন খুশি হয়েছি তেমনি ব্যথা অনুভব করছি, কারণ এ মুহূর্তে জেকীকে পানি পান করাতে না পারলে সে মৃত্যুবরণ করবে। আমি জেকীর জন্য পানির সন্ধানে গেলাম, অনেক খুঁজেও কোথাও পানি পেলাম না, ফিরে এলাম যেখানে জেকী আছে সেখানে। কিন্তু এসে দেখি জেকীর পাশে সন্তান নেই, শুধু জেকী শুয়ে আছে মাটির মধ্যে।

ব্যস্তকণ্ঠে বললো বনহুর—তারপর, বলো তারপর কি হলো?

মনে করলাম জেকী ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তার পাশে সন্তান কই? তাড়াতাড়ি জেকীর শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, জেকী, জেকী আমাদের সন্তান কোথায়? কে দেবে তার উত্তর—জেকী চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম, কিন্তু জেকী আর চোখ মেলে চাইলো না। প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারালাম, হারালাম আমার শিশু কন্যাটিকে! বৃদ্ধের গলা ধরে আসে, বারবার সে হাতের পিঠে চোখ মুছতে লাগল।

বললো বনহুর—জেকীর মৃত্যু হলো কিন্তু সেই শিশুকন্যা কোথায় গেল জানতে পারিনি?

পেরেছিলাম......

সত্যি?

হাঁ...সে আরও অদ্ভুত এক কাহিনী, কিন্তু আমি বলতে পারছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে......

কষ্ট! কেন কিসের কষ্ট?

তুমি তো কারও পিতা হওনি, তাই বুঝতে পারছো না আমার বুকে কি জ্বালা! বৃদ্ধ দুই হাতে নিজের বুকটা চেপে ধরলো।